KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নন্দী রোড, যাদবপুর, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রবেন্দু দাশগুপ্ত
Title : অলিন্দ (ALINDA)	Size : ৪.৫"/৫.৫"
Vol. & Number : (গ্রীষ্ম সংকলন) (শরৎ সংকলন) (গ্রীষ্ম সংকলন) (শরৎ সংকলন)	Year of Publication : ১৩৭১ ১৩৭১ ১৩৭২ ১৩৭৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রবেন্দু দাশগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শারদ সংকলন

১৩৯৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আলিন্দ

সম্পাদক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অলিন্দ

ষাণ্মাসিক সাহিত্য সংকলন

শরৎ ১৩৯৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক সরকার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সুমিতা চক্রবর্তী, নবনীতা দেব সেন, বাসুদেব দেব, বিজয়কুমার দত্ত, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায়, কবিরুল ইসলাম, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, সামসুল হক, কালীকৃষ্ণ গুহ, শামশের আনোয়ার, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, মানিক চক্রবর্তী, আশিস সান্যাল, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা বসু, বাপী সমাদ্দার, রথীন্দ্র মজুমদার, রাণা চট্টোপাধ্যায়, অভী সেনগুপ্ত, অশোক দত্তচৌধুরী, নির্মল বসাক, শুকতারা রায়, সুব্রত রুদ্র, সুবোধ সরকার, প্রমোদ বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, নির্মল হালদার, সুজিত সরকার, অনুরাধা মহাপাত্র, শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম হাজরা, শান্ত রায়, নিতাই জানা, দীপ সাউ, রাখাল বিশ্বাস, গৌরীশঙ্কর দে, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, দিব্য মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় রায়, শ্যামলবরণ সাহা, পার্থপ্রিয় বসু, রাহুল রায়, অরিজিৎ দাশগুপ্ত, প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, শম্ভু বসু, মৌ দাশগুপ্ত এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত
প্রকাশক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রণ : স্বর্ণাক্ষর
৩১৯/২ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া-১

দাম : পাঁচ টাকা

'অলিন্দ' প্রসঙ্গ

'অলিন্দ', অনেকদিন পরে, আবার প্রকাশিত হ'লো। দীর্ঘদিন ধ'রে অনিয়মিতভাবে বেরুচ্ছে 'অলিন্দ', এবার থেকে বছরে দুটি সংখ্যা বেরুবে—একটি বৈশাখে, অন্যটি শরৎকালে, পুজোর সময়ে। কবিতা নির্বাচন, এবং কবিতা বিষয়ে আলোচনার প্রকৃতির ভেতর থেকেই একটি সম্পাদকীয় নিঃশব্দে রচিত হয়, কিন্তু সেই সূত্রটি অনেকে আবিষ্কার ক'রতে পারেননি ব'লেই এবার 'অলিন্দ' প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলি। আমি কোনোদিন রাজনীতি করিনি, তবে দলমতনির্বিশেষে যে কোনো কবির কবিতাকেই এই পত্রিকায় আমি স্থান দিতে রাজি, যদি তাঁর কবিতা আমার ভালো লাগে। একথাও অনেকে বলেছেন, ব'লে থাকেন, এবং এই সদুক্তি প্রায় ক্লিশের মতো শোনাতে পারে। কবিতা নির্বাচন বিষয়ে আমি দুটি নিয়ম পালন ক'রতে চাই—এক, যে কোনো কবির কবিতাই আমি ছাপতে আগ্রহী, যদি তা নান্দনিক শর্ত পূরণ করে; দুই (যা প্রথমটির চেয়েও জরুরি), তা যদি আমাদের জীবনবোধকে সম্প্রসারিত করে। জীবনবোধ কাকে বলে তা নিয়ে বিতর্ক বিতন্ডার প্রয়োজন নেই, কথাটিকে আক্ষরিকভাবে ধ'রলেই আমার উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে।

এ-সংখ্যায় শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পঞ্চাশের কয়েকজন কবির কবিতাভাবনা নিয়ে তাঁর যে মতামত, তার জন্যে সম্পাদক দায়ী নন, তবে তিনি যে এক্ষেত্রে বিশেষ আলোকপাত করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যে দলাদলি সব যুগে সব দেশেই ছিলো এবং আছে, তবে পশ্চিমবঙ্গে তার মাত্রা একটু বেশি এবং কোথায় যেন রুচির অনটন হচ্ছে মনে হয়—বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে। এমন কোনো কবি নেই যিনি সর্বজনগ্রাহ্য—না রবীন্দ্রনাথ, না নজরুল, না জীবনানন্দ, না সুকান্ত। কবিতা বিষয়ে কারো ফরমান কেউ মেনে নেবেন এটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। একজন কবিকে পাঁচভাবে দেখা হয় এখন; এক, প্রকাশকের চোখে, দুই গণমাধ্যমের চোখে, তিন, লিটল ম্যাগাজিনের মাপকাঠিতে, চার, কবির রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে, পাঁচ, কবির ভক্তদের চোখে। কবিতা অধিকাংশ লোক পড়েন না, গল্প উপন্যাস টেলিভিশন চলচ্চিত্র

খেলাধুলো এসব নিয়েই সময় কাটান (যদিও এদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে তার সংখ্যাও স্বাভাবিক কারণে নগণ্য), এবং তাঁদের দোষ দেয়া যেমন বাতুলতা তেমনি, অন্যদিকে, একথাও খোলাখুলিভাবে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বৃহত্তর পাঠকচর্চা কবিতাকে যে বিলাসিতা মনে করেন কবিতা তা নয়। কবিরা তাই প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে আসেন নিজেদের কাছে, তৈরী করেন গোষ্ঠী, দল, উপদল। একটি গোষ্ঠী, বলা বাহুল্য, অন্য গোষ্ঠীকে সহ্য ক'রতে পারে না, এবং এই শত-দল-শোভিত কবিসমাজে কবিরা নিজের নিজের সঙ্ঘে একত্র হন সেই একই কারণে, যে কারণে মানুষ সমাজে যূথবদ্ধ হয়। পশ্চিমবাংলার কবিতার রাজত্বে বা রাজনীতিতে এমন কিছুই ঘটছে না যা বুদ্ধির অগম্য, তাকে নানা কারণে কেউ না বোঝবার ভান করছেন বা স্বীকার ক'রেও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে আছেন। ভালো কবিতা যেকোনো পত্রিকাতেই লেখা যেতে পারে— বহুলপ্রচারিত পত্রিকা থেকে শুরু ক'রে অণুতম কণিকাপত্রিকায়। কোন্ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়, তা নিয়েও মাঝেমাঝে ভুল বোঝাবোঝি তৈরি হয়। এই ডামাডোলের মধ্যে 'অলিন্দ' যে আবার প্রকাশ করছি তা হয়তো এক-ধরনের নায়কমুদ্রা। অনেক তরুণ কবি এখন ভালো কবিতা লিখছেন। তাঁদের সবার সঙ্গেই যোগাযোগ ক'রবার ইচ্ছে রইলো।

মহালয়া, ১৩৯৬ **প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩ নর্থ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আবছায়াময় কেল্লার মাঠে

না-লেখা কবিতাটির একটি শব্দ হারিয়ে গেল আজ বিকেলবেলা
যেমন ভাবে মহাকাশে নিরুদ্দেশে যায় অন্তরীক্ষের নাবিক
কিংবা একটা ঘাসফুলকে না ছুঁয়েই উড়ে যায় প্রজাপতি
কিংবা একটা ঢেউ তীরের কাছে পৌঁছোবার আগেই ভেঙে যায়
সেই মুহূর্তে সেই শব্দটিই আমার জীবনসর্বস্ব, তাকে না পেলে
আমি কোথায় যাবো ?
রাস্তায় এত মানুষের ভিড়, কেউ বুঝবে না আমার কী খোয়া গেছে
একটি শব্দ, একটি মাত্র শব্দ, চার অক্ষরের
হে বৃষ্টি-ভেজা মাদক বিকেল, তুমি কেন তাকে হরণ করলে ?

তখন আমি সেই বিকেলের নামে মামলা দায়ের করি
দেবী সরস্বতীর আদালতে
হংসেশ্বরী হয়ে তিনি বীণা হাতে নিয়ে বসে আছেন
রাজভবনের পেছনের পটভূমিকায়
অনবরত ট্রামের কর্কশ আওয়াজ ও বাসের বিশ্রী ধোঁয়া তিনি মুছে দিলেন
হাতের এক ইঙ্গিতে
পূরবী রাগিনীর সুরে তিনি হাসলেন
নিজেকে সুন্দর রাখার চেষ্টায় তিনি এতই ব্যস্ত যে শুনলেন না
কোনো আর্জি
বিকেলটিকে বেমালুম খালাস করে দিয়ে তিনি বললেন, সমুদ্রে যাও
আমাকে বললেন, তুমিই তো আসল আসামী, নাও দণ্ডাজ্ঞা
চার অক্ষরের বদলে তোমাকে সেই তিন অক্ষরের
শব্দটি বসাতে হবে, মনে আছে ?

হঠাৎ বজ্রের গম্ভীর গর্জন, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আর
আসন্ন অন্ধকার শূন্য করে দেয়
জন পদবী
আমি একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, কৈশোরের ছবি ভেঙে যায়
সেই তিন অক্ষর ? কোন্ তিন ? মধ্যে যুক্ত বর্ণ আছে কি ? ছন্দ
ভেঙেও বসানো যায় ?

না-লেখা কবিতাটি একটি জোনাকি হয়ে উড়তে থাকে
আবছায়াময় কেল্লার মাঠে.....

আলোক সরকার

মাধবী

তোমার ফেরার সময় ক্রমে নিকট হল।
কতদূরের ফেরার সময় আস্তে আস্তে
আবছা একটু কুয়াশা-রঙ। বিকেলবেলায়
অল্প একটু হাওয়া দিচ্ছে। দুটো পাতা
থেমে থেমে নেমে যাচ্ছে মাঠের ভিতর
তেমন কোনো তাড়া তো নেই। যেমন আঁধার
হিজলগাছের মাথার থেকে ক্রমে ক্রমে
নেমে আসছে—কোথাও কোনো শব্দ বাজছে?
তোমার ফেরা কোথাও কোনো শব্দ বাজায়!

কে দেখে আর কুয়াশা-রঙ। জানলা থেকে
বাড়ির ভিতর এসে দাঁড়াই। সারা বাড়ি
আজো তেমন নিশ্চুপতা যেমন প্রথম।
ঝুল নেমেছে, কার্নিশের প্রান্ত ভাঙা।
কেবল সেই মাধবী, ওই রাঙা বসন
থরে থরে সারা দেয়াল জুড়ে বাজছে।
মাধবীফুল ঠিক কেমন শব্দ বাজায়
কে বা তেমন প্রশ্ন তুলছে? দিনশেষের
মাধবীফুল প্রাচীন আরো তুহিন শব্দ।

ভাস্কর চক্রবর্তী

ছেলেবেলা

একতলা দোতলা বাড়ি কাগজের দুটো কি তিনটে
(কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই)
জল ঝরবে বলে এক মায়াঝর্ণা তৈরী হয়েছিলো
শহর কী শান্ত দিন সুরকি-মেশানো রাস্তাঘাট
এদিক-সেদিক গাড়ি কবেকার নিশ্চল নিশ্চুপ
আর স্তব্ধ হালকা রহস্যময় দু-চারজন শ্বেতশুভ্র নারী
(পুরোনো চীনেমাটির)
হঠাৎ আপনাকেও ইশারায় নিয়ে যেতে পারে

সুব্রত রুদ্র

চার চুমু

একটি চুমু রোদ ঝলকানো
একটি চুমু সূক্ষ্ম তিলের ভিতর দিয়ে…
একটি চুমু আকর্ণবিস্মৃত চোখের মতন ভিতরে সব দেখছে
একটি চুমু চক্ষুদান করে আমার

বাসুদেব দেব

কয়েক টুকরো

আগুন

ছল চাতুরি করে আজ এইখানে এসে
দাঁড়িয়েছি
টের পাই নি
কখন ধূর্ত শহরকে ঘিরে ধরেছে বন
আর শুকনো বনে আগুন কী ভয়ংকর

এখন আর কোন চালাকি চলবে না
আমাকে নিশ্চিত আগুনের মুখোমুখি হতে হবে
বাঁচবার এখন একটা মাত্রই উপায়
আমাকে এবার আগুন হতে হবে

জল

বিধান সভায় এ বছর খুব হট্টগোল হলো
গুন্ডাদের হাতে মরলেন সফদার হাশমি
রুশদির বই নিয়ে চল্ল শয়তানির হদ্দ

এ সব কিছু জানে না হরিণডাঙ্গার বউ
লম্ফের ওপর খসে পড়ছে তার ছেঁড়া আঁচল
ভাঙা টিপকলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে
তার রোগা শরীর
কেবল জং ধরা যন্ত্রের কোঁকানি
সমস্ত শরীর দিয়ে তার জল ঝরছে
টিপকলে জল নেই

কল কতদিন সারায় না পঞ্চায়েৎ
কত নিচে নেমে গেছে জল কত নিচে

ঈশ্বর

তুমি পুরুষ না নারী জানি না
দেখা দাও
তুমি ভীষণ না মধুর জানি না
দেখা দাও
পাথরে মাথা কুটে কুটে রক্ত

হঠাৎই পাথরের আড়াল থেকে
বেরিয়ে এসে আমার চোখে চোখ
দাঁড়াল এক লহমা
তারপরই অন্ধকারে মিশে গেল

একটা ইঁদুর

মানুষ

আরো কি জ্বলন বাকি আছে তোর
আরো ধিকি ধিকি পুড়বি ?
ড্রিলিং মেশিনে লাখো বছরের
পুরোনো পাথর খুঁড়বি ?

তবে ধিকিধিকি পুড়ে যা মানুষ
নিজে খা নিজেকে পুড়িয়ে
সারের জন্য ছাইগুলো দিস
তৃতীয় বিশ্বে উড়িয়ে

মৃত্যু

থেমে যায় ইতিহাসের গুঞ্জন
এক রাশ কাগজের কুচি আকাশে ওড়ে
জেলেদের কুঁড়ে ঘরে নিভে গেছে ক্ষীণ আলো
তখন ঝড়ের সমুদ্রের মত আলুথালু
নিয়তির থেকেও নিষ্ঠুর সেই নারী

জন্ম নেয়
টুকরো টুকরো চাঁদের পালক
আমার রক্তমাংস হাড় নুন ফসফরাস মেখে
ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, স্বপ্নে, স্বপ্নের বাইরে

জলের শব্দ না পায়ের আওয়াজ
কে যেন কাকে খোঁজে...কে যেন কাকে...

সুনীল বসু

ব্যাঙটা

মাঝরাত্তিরে
একবার বাথরুমে যাই
বদখত বিতিকিচ্ছিরি একতাল মাংস—
ব্যাঙটা নিঝঝুম অন্ধকারে
আমাকে দেখে থপ্‌থপ্‌ থপ্‌থপ্‌ নড়ে ওঠে
আমি আচম্‌কা দারুণ ভয় খেয়ে যাই
হুস্‌হাস্‌ করে ওকে তাড়িয়ে দিই
ক'দিন চলছিল এইরকম মাঝরাত্তিরে
একদিন আর ব্যাঙটার অস্তিত্ব টের পেলুম না

ব্যাঙটাকে তবে কি সাপে খেয়েছে—মৃত্যু—
ব্যাঙটা কি কোনো বান্ধবী খুঁজে পেয়েছে—প্রেম—
ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম বিছানায়
কেমন একটা শূন্যতা ঘিরে ধরল
ব্যাঙটা নেই ব্যাঙটা নেই
এই কি অনস্তিত্ব
এই কি চিরন্তন না-থাকা !

নবনীতা দেবসেন

যদি

এইখানে, অন্য এক মেয়ে হোতো যদি
তবু কি এমন-ই থাকতে
কৌতূহলশূন্য উদাসীন
এমন আপন মনে অলসশয়নে
অমনস্ক, সুদূর, একাকী ?
একবারও পড়তে না ঝুঁকে
কাঁধের ওপরে
একবারও দেখতে না চেয়ে
কী লেখে সে মেয়ে ?

তখন কি রাখতে না হাত
সেই ব্যস্ত হাতের ওপরে
বলতে না, "এইবারে থাক
অনেক হয়েছে লেখালিখি
মুখ তোলো, চেয়ে দ্যাখো
কতোক্ষণ একা একা
ধৈর্যহীন প্রতীক্ষায় আছি
প্রীয়মান, তোমার প্রেমিক ?"

ঘোর তো ঘোচারই জন্যে, জানি—
ঘন্টা বেজে গেলে
অবেলার অভিমানে
মান ভাঙে যম।
তবু, ওঠে দুর্নিবার তরঙ্গ উদ্বেল—
যার শুধু আছড়ানো আছে, শুরু দেখা নেই।

কবিতা : পঞ্চাশ

সুমিতা চক্রবর্তী

বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্টতা ও প্রবণতা নিয়ে এখনও বেশকিছু মতবিরোধ থেকে গেছে। সেই সময়ের কবিরা প্রায় সকলেই এখনও সৃষ্টিশীল। বলা যায়, ঠিক এখনকার পাঠকদের কাছে তাঁরাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে কাছের কবি। তরুণতর কবিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, বিরাগে ও ঈর্ষায় অত্যন্ত জীবন্ত। তবু আজ যখন তিরিশ বছর পার হলো তখন সেই সময়ের কবিতা ও কাব্যভাবনা নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে থেকে হয়তো একটু সামগ্রিক চিন্তা করা যেতে পারে। আমরা ভেবে দেখতে পারি— বাংলা কবিতাকে কী দিয়েছে সেই সময়।

প্রথম সমস্যাটি এই— দশক-বিভাগ কি আমরা মানবো ? কবির ক্ষেত্রে ? এমনকি কালের ক্ষেত্রেও ? কবিকে দশক-চিহ্নিত করবার চেয়ে কাল-কে দশক-চিহ্নিত করায় বিতর্ক অনেক কম। তবু বিতর্কটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না কারণ কবিকে নিয়ে আর কবির সময় নিয়ে কিছু বলার মধ্যে ভেদরেখা টানাও সম্ভব নয়। তবু কালের কথাটাতেই আগে আসা যাক।

প্রতি দশবছরেই সময়ের প্রবণতা বদলে যায় না— একথা সঙ্গতভাবেই বলেন অনেকে। ঠিকই, অঙ্ক কষে ঠিক দশ বছর পরে পরেই বদলায় না। তবু একথা তো স্বীকার্য—কাল পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তেই তা বদলায় একটু একটু করে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিদিনই তা চোখে পড়ে না। কিছুটা সরে এসে যখন একসঙ্গে কয়েকটি বছরকে দেখি তখন যেন বোঝা যায়, একসঙ্গে একগুচ্ছ বছর তার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী একগুচ্ছ বছর থেকে একটু আলাদা। সেই একগুচ্ছ-কে আমরা দশ বা বারো, পাঁচ বা সাত—যা-খুশি ধরতে পারি। অথবা সংখ্যার একটু হেরফেরও ঘটতে পারে। এসব নমনীয়তার জন্য প্রস্তুত থেকেই আলোচনার সময়ে কাজ চালানোর মতো একটি পরিমাপক আমাদের ধরে নিতে হয়। 'দশক' সেই পরিমাপক। গণিত-শাস্ত্রের একক-দশক-শতক-সহস্রের হিসেবে বহুদিন থেকে অভ্যস্ত বিশ্বের তাবৎ মানুষ। 'শতাব্দ'ও তো সময়ের একটি কৃত্রিম বিভাজন। তবু সেই শতকের হিসেব ধরেই আমাদের সবরকম ইতিহাস-ভাবনাকে একটা শৃঙ্খলা দান করা হচ্ছে।

মোটামুটিভাবে পঁচিশ-তিরিশ বছরে আমরা নতুন প্রজন্মের যে আবির্ভাব ও তাদের নবীনতার কথা ভাবি তা-ও কি ঠিক ঠিক মেলে সব সময়ে? অনেকেই এগিয়ে থাকেন তাঁর সময়ের চেয়ে, পিছিয়েও থাকেন অনেকে। সম্প্রতিকালে শঙ্খ ঘোষ খুব জোরের সঙ্গে দশক-বিভাগের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন (কবিতালেখা কবিতাপড়া, শঙ্খ ঘোষ, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ১৯৮৮)। কিন্তু তিনিও খানিকটা মেনে নিয়েছেন যে—ইতিহাসবিদের দশক-বিভাগটি প্রয়োজন হতে পারে—"...ইতিহাস বিবৃত করবার কারণে, বোঝাবার জন্য অনেক সময়েই দরকার হতে পারে কোনো একটা কালখণ্ডকে চিহ্নিত করবার, বলাই যায় যে অমুক দশকের ঘটনা এটা।" (পৃ ১৬) কাজেই কবিতার আলোচনায়— যা কোনো-না-কোনোভাবে ছুঁয়ে থাকবেই কবিতার ইতিহাসকে— দশক মনে রাখার দায় প্রায় বিকল্পহীন। সে-কারণেই পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় আপনা থেকেই আলোচনার সময়ে, কবির পরিচয় দেবার সময়ে দশকের উল্লেখ করা হচ্ছে। এককভাবে কেউ তো নির্দেশ জারি করে দশকের উল্লেখ বাধ্যতামূলক করে দেননি!

শঙ্খ ঘোষের আপত্তিটি প্রধানত কবিকে দশকের সীমায় আবদ্ধ করা সম্পর্কেই। সত্যিই এ বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। পঞ্চাশের কবির লেখায় কেবলমাত্র পঞ্চাশের দশকের সময়-প্রবণতাই সক্রিয় থাকে— এ ধারণা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তও। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আশির দশকেও যিনি লিখে যাচ্ছেন পরবর্তী সময়ের প্রবণতা তাঁর লেখায় রূপ নেবেই। তাহলে কেন কাউকে 'পঞ্চাশের' বা 'সত্তরের' কবি বলে আলাদা করা?

তারও একটা কারণ আছে, যৌক্তিকতা আছে। আলোচনার সময়ে যখন কাউকে 'পঞ্চাশের কবি' বলছি তখন প্রথমত কেবল এটুকুই বোঝাচ্ছি যে, পঞ্চাশের দশকে সেই কবি প্রথম তাঁর স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ সময়ের প্রবণতার ভেতর থেকেই ঘটেছিলো তাঁর আবির্ভাব। কবিরা যেন না ভাবেন— এমন বলার মানে তাঁদের সীমাবদ্ধ করা। বরং এই মনে রাখাটি আমাদের সবসময়ে সচেতন রাখে কবির বিবর্তন সম্পর্কে। আজকের সুভাষ মুখোপাধ্যায় মধ্য-তিরিশে শুরু করেছিলেন, তিরিশের জীবনানন্দ চল্লিশে বদলেছিলেন, এসব কথা মনে না রাখলে কোনো আলোচনাই সম্ভব নয়। একথাও মনে রাখি যে, একই সময়ের কবিরা বেশ আলাদাও হয়ে

থাকেন চরিত্রে। তবু যখন একসঙ্গে কয়েকজনকে একটা দশকের কবি বলে ভাবা হয় তখন তাঁদের রচনায় সমকালের সদৃশ প্রবণতাগুলির যেটুকু প্রকাশ থাকে সেটুকুই ইঙ্গিত করা হয়। তার বেশি কিছু চাপালে তা ভুল হবে। তিরিশের কবিরা যে একটু বেশি পশ্চিমী কবিতা-সচেতন ছিলেন, সকলেরই ছিলো কিছুটা মননোজ্জ্বল থাকার ইচ্ছে, সকলেই খুঁজে ছিলেন রবীন্দ্র-কবিতা থেকে ভিন্নতর আঙ্গিক —এটুকু কথা বলাই যায়।

বিশেষ একজন কবিকে বিশেষ একটি দশকের কবি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আবির্ভাবকালটি যে স্পষ্ট হয়ে থাকে মনের মধ্যে— তার একটা সুবিধেও আছে। পঞ্চাশের একজন কবি সত্তরে যা লিখেছেন তার মধ্যে বিবর্তনের চিহ্নটি খুব সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। পঞ্চাশের একজন কবির সত্তরের কবিতা আর সত্তরের কবির সত্তরের কবিতায় ভেদ থাকবেই, কারণ দ্বিতীয় জন বিবর্তনের পথ ধরে আসেননি। দুই কবির সত্তরের কবিতার মনোভঙ্গি ও ভাষাভঙ্গির তুলনা সম্ভব হয় তখনই, যখন দুজনের সময়ের পার্থক্যটি মনে রাখি। এজন্যই তো রবীন্দ্রনাথের অমঙ্গলবোধের কবিতা কিছুতেই সুধীন্দ্রনাথের অমঙ্গলবোধের কবিতার মতো হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন-কে কোনো একটা দশকের কবি বলে সেকালে চিহ্নিত করবার দরকার হয়নি কারণ সেই কালে সমশক্তিসম্পন্ন অনেক কবি উঠে আসেননি একালের মতো। রচনা-কর্মে ও কবিতার আলোচনায় প্রখরভাবে সময়-সচেতন হবার মানসিক অভ্যাসও অর্জিত হয়নি। সময়বোধের অনাদি-অনন্ত ভাবটাই পুরোনো কালের বৈশিষ্ট্য। সময় যে মুহূর্তে মুহূর্তে একটি বিপন্নতার পর্যায় থেকে আর একটি বিপন্নতার পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে—এসব চেতনা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভাঙচুরের আগে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি!

কোনো কবিকে বিশেষ একটি দশকের কবি বলে পরিচিত করলে প্রায় সার্বিকভাবেই সংক্ষেপে তাঁর আবির্ভাবলগ্নটি বোঝানো হয়—তার বেশি কিছুই নয়। এই আলোচনাতেও তাই হয়েছে। 'দশকোত্তীর্ণ' হয়ে উঠতে কোনো কবিরই বাধা নেই। নিজের ক্ষমতাতেই তা হন তিনি। কিন্তু যেকালে তিনি শুরু করেছিলেন সেই কালটিকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াও কোনো আলোচনায় সম্ভব নয়। একই সঙ্গে সব কবিই সময়ের এবং সময়োত্তরণের। রবীন্দ্রনাথও তাই। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা বলে দিতে হয় না— তিনি

রবীন্দ্রনাথ বলেই। সব সময়েই তাঁর আবির্ভাবলগ্নটি আমাদের স্মরণে থাকে বলেই।

পঞ্চাশের দশকের কবিতা সম্পর্কে প্রথমেই মনে হয় যে— নানাদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে কবিতাচর্চার একটা তৈরি পরিবেশ পেয়েছিলেন পঞ্চাশের কবিরা। প্রথমত, তাঁরা যে যেখানে শৈশব কাটান না কেন—তাঁদের কবিতা-বোধে, ছন্দবোধে প্রথম মুগ্ধতা সঞ্চার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—সে-ও বৃহত্তর অর্থে রাবীন্দ্রিক প্রভাব। তারপর অধিকাংশ পঞ্চাশের কবির স্কুল-জীবনের শেষের দিকে ১৯৪৫-১৯৪৭-এর টালমাটাল দেশকাল। ফলে প্রায় সকলেই এসে জড়ো হলেন কলকাতায়। কেউ কেউ আগে থেকেই ছিলেন। ভবিষ্যৎ কবিদের পারস্পরিক পরিচয় ঘটে যেতে লাগলো স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৮-৪৯-এর কলকাতা। বহু রক্ত ঝরিয়ে এলেও স্বাধীন স্বদেশ তরুণদের মনকে খানিকটা সৃষ্টির আনন্দলোকের আশা-উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখাবেই। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অস্থিরতা যতই থাকুক, তরুণ কবিদের সামনে তখন তিরিশ ও চল্লিশের কবিরা রবীন্দ্রোত্তর কবিতার এক বৈচিত্র্যময়, সমৃদ্ধ সম্ভার নিয়ে উপস্থিত। তাঁদের সামনে তখন একাধিক প্রতিষ্ঠিত রুচিশীল পত্রিকা যেগুলিতে যত্নের সঙ্গে কবিতা ছাপা হয়—'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'সাহিত্যপত্র', 'অগ্রণী' (দ্বিতীয় পর্যায়)। তাছাড়াও একান্তভাবে কবিতার জন্য ছিলো বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'— তরুণ কবিরা যে-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হওয়াকে সাময়িকভাবে সাফল্যের সীমা বলে গণ্য করতেন। আর ছিলো শুদ্ধসত্ত্ব বসুর ক্ষীণাঙ্গ কবিতা-পত্র 'একক'— যদিও মৃদুকণ্ঠ তবু জমজমাট 'কবিতা'র পাশে একটি একলার সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। 'দেশ' পত্রিকার কবিতা-বিভাগটিও স্মরণীয়— সেই সময়ে সম্ভবত সেটি দেখতেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিরিশ-চল্লিশের এইসব পত্র-পত্রিকাতেই পঞ্চাশের কবিদের প্রথম আত্মপ্রকাশ, তাঁদের সাহচর্যেই কবিতার আকাশে তাঁদের প্রথম পক্ষ-বিস্তার। বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ আরো কেউ কেউ অনেক সময়েই তরুণতর কবিদের সহায়ক অগ্রজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আরো একটি সুবিধে ছিলো পঞ্চাশের দশকের কবিদের, তাঁদের সামনে ছিলো কবিতার বহুবিধ রূপ। একদিকে তিরিশের কবিদের লেখায়

ব্যক্তিক আবেগ ও বিশ্ববীক্ষণের সংযোগ, অন্যদিকে চল্লিশের কবিতার একটি ধারায় সরল আত্মময়তা ও অন্য ধারায় সরল সমাজ-রাজনীতি-মনস্কতা। ফলে এই বিশ্বাসটি পঞ্চাশের কবিরা সহজেই অর্জন করলেন যে কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক—কোনো কিছুরই কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

প্রতিটি নবীন প্রজন্মই যেমন পূর্ব-ঐতিহ্য গ্রহণ করে (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) তেমনিই নিজের মতোও হয়ে উঠতে চায়। নিজের মতো হবার পথে যে-মানসিকতার ওপর তার নির্ভর সেই মানসিকতা অনেকটাই গড়ে ওঠে সময়ের সামাজিক-রাষ্ট্রিক চরিত্রের ফলে। স্বাধীনতার ঠিক পরেই স্বদেশমুখী হবার টান জাগে ব্যাপকভাবে— হয়তো কিছুটা অসচেতন-ভাবে। স্বাধীন দেশের নাগরিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও হয়তো কাজ করলো ভেতরে ভেতরে। পাশ্চাত্য কবিতার প্রতি যে-ঝোঁকটি ছিলো তিরিশের দশকে, তার থেকে সরে এলেন পঞ্চাশের কবিরা। নিজের কথা ও নিজেদের কথাই বেশি করে বলতে ইচ্ছে করলো তাঁদের। আর আঙ্গিকের দিক থেকে বিদেশমুখী না হবার মতো সবলতা বাংলা কবিতা অর্জন করে নিয়েছে আগেই।

১৯৪৬-৪৭-এ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাভূমি সোভিয়েত দেশ থেকে শিল্প-সাহিত্যের ওপর অতিরিক্ত প্রচারমূলকতার যে-দায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে ছিলেন বামপন্থী সাহিত্যিকদের অনেকেই। তখন থেকেই সমাজমনস্ক কবিদের মধ্যে একটা ভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো। স্বাধীনতার ঠিক পরেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গিয়ে বামপন্থীরা সার্বিক জনপ্রিয়তা কিছুটা হারালেন। ১৯৪৮-এ দ্বিতীয়বার নিষিদ্ধ হলো কমিউনিস্ট পার্টি। সব মিলিয়ে সমাজতন্ত্র-বাদ-ঘেঁষা কবিতা রচনার চল্লিশ দশকীয় উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়লো। যদিও পঞ্চাশের দশকের 'রোমান্টিক' বা 'আত্মময়' বা 'স্বীকারোক্তিমূলক' কবিতার রচয়িতারাও কেউ কেউ ছাত্রজীবনে বামপন্থী ছাত্রগোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। —"সমাজ এবং রাজনীতি প্রথমে আমাদের ওপর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কলেজে পড়াকালীন নিজে অনেক কাজও করেছিলাম। পার্টির সঙ্গে যথেষ্ট জড়িয়ে গিয়েছিলাম।... কমিউনিজমের সংগে সেদিন একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। আস্তে সেই সক্রিয়তা থেকে দূরে সরে এসেছি।" (অন্বীক্ষণ, শারদীয়, ১৩৭৫) —এই উক্তি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। একথা আরো দু'একজনের সম্পর্কে সত্য। কিন্তু কলেজ ছাড়ার পর লেখা-

লেখির জগতে এসে ঐ সমাজমুখী ভাবনা-তরঙ্গ তাঁদের তেমন আকৃষ্ট করলো না। খুবই লক্ষণীয় যে পঞ্চাশের কোনো কোনো কবি— যাঁরা খুব অল্প বয়স থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তাঁরাও শিল্প-সাহিত্য-বোধের জগতে নিজস্ব অনুভবলোকের নিমগ্নতার তলটিই বেশি পছন্দ করেছিলেন। যেমন দেখি তরুণ সান্যালের 'মাটির বেহালা'-র কবিতাগুলিতে এবং তার পরবর্তীকালেও। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রথম দিকের কবিতায় বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রকাশ থাকলেও অচিরেই তিনি নিজের মনের কথার জগতে চলে এসেছিলেন। অমিতাভ দাশগুপ্ত শুরু করেছিলেন বোদলেয়র-এর কবিতার অনুবাদ দিয়ে। সময়-প্রবাহের মূল স্রোতের ভেতরে ভেতরে সব সময়েই চলে একটি বিরোধী স্রোত। সেই বিরোধে-মিলনে প্রতি মুহূর্তে গড়ে ওঠে যে নবীনতা অনেক সময়ে বেশ কিছুটা সরে আসে অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় থেকে। সেই ভাবেই যেন পঞ্চাশের কবিতার আত্ম-মুখিতা সরে এলো চল্লিশের কবিতার সমাজমুখিতা থেকে।

পঞ্চাশের কবিরা কিন্তু কোথাও এমন কথা বলেননি যে চল্লিশের দশকের কবিতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা আত্মানুভবী কবিতা লিখেছেন। প্রতিক্রিয়া কিছুটা নিশ্চয়ই ছিলো তবু তাঁদের কাব্যচেতনার পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিরিশের কবিরাই। সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁরা কিন্তু তিরিশের কবিদের বিশ্ব-বীক্ষণের বিস্তারের তুলনায় নিজেদের ঘরের ও মনের দিকে তাকিয়েছিলেন বেশি— একথা বলেছি আগেই।

অবশ্যই সেই উত্তরাধিকারের ধরনে ছিলো অনেক বিভিন্নতা। জীবনানন্দের নিবিড়তা তাঁদের মুগ্ধ করলেও জীবনানন্দীয় উচ্চারণের ভঙ্গিটিকে তাঁরা সাধারণভাবে অনুসরণযোগ্য বলে ভাবেননি। জীবনানন্দের পৃথিবী ছিলো জটিল। পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর সংবেদনাও ছিলো বহু-স্তরিত এবং কোনো অর্থেই সরল নয়। সেই পৃথিবীর অধিকার ছিলো না বলে বিনয় মজুমদার বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাগ্‌ভঙ্গির বহিরঙ্গ জীবনানন্দকে স্মরণ করালেও প্রকৃতপক্ষে তা ভিন্ন ধরনের অর্থ বহন করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শব্দ-শাসন ও বিষ্ণু দে-র ভাষার নৈর্ব্যক্তিক সচেতন ভঙ্গি আবেগকে অসংহত উচ্ছ্বাসে পরিণত হতে দেয় না বলে তা-ও তাঁদের কাউকে কাউকে আকর্ষণ করেছিলো। আলোক সরকারের প্রিয় কবি যে

বিষ্ণু দে—তা বিষ্ণু দে-র সমাজতন্ত্রবাদী চেতনার কারণে নয়। আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় দীপক মজুমদার লিখে-ছিলেন—"অতঃপর যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন আধুনিকতা জীবন প্রার্থনা করবে কেবল বুদ্ধদেব বসুর কাছে।" (কৃত্তিবাস, ত্রয়োদশ সংকলন, ১৩৬৭)। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিযাত্রিকতা ও অমিয় চক্রবর্তীর কস্‌মোপলিট্যানিজম্‌ মনে রাখলে বলতেই হবে যে পঞ্চাশের দশকের কবিতার জগৎ বাইরের দিক থেকে বেশ কিছুটা ছোটো। কিন্তু সেই বিস্তারের পরিবর্তে পঞ্চাশের কবিদের লেখায় আমরা মনোলোকের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রচ্ছায় অনুভব করতে পারি।

আরো একটি কারণেও মনে হয় যে পঞ্চাশের কবিদের সেই দশকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার জগতে যে-সকরণ তা হয়তো ততটা চল্লিশের সমাজমনস্ক কবিতার প্রতিক্রিয়ায় নয়, যতটা তিরিশের অনু-সৃতিতে। সেই অনুসৃতি চল্লিশের দশকের অনেক কবির লেখাতেই দেখা যায়। নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার, অশোকবিজয় রাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী— কারোর কবিতাতেই প্রত্যক্ষভাবে কোনো সামাজিক প্রগতির ঘোষণা নেই। বাম-পন্থী চিন্তায় বিশ্বাসী হলেও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় বা পরবর্তী-কালে বহু সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে তুলে নেওয়া সংবেদনায় কবিতা লিখলেও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নীল নির্জন' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় আত্ম-গত রোমান্টিকতারই প্রকাশ। এটাও হয়তো বলা যায়, চল্লিশের এই কবিরাই তিরিশের কবিদের বিশ্বমুখী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জায়গায় আত্ম-মুখী ব্যক্তিগত চেতনাকে কিছুটা নিয়ে এলেন। তিরিশের কবিদের পৃথিবী তুলনায় সরলতরভাবে প্রতিভাসিত হলো এঁদের লেখায়।

বস্তুত, কেবলমাত্র চল্লিশের দশকের সময়সীমা এবং সেই সীমা-অন্তর্গত কবিদের সংখ্যা যদি বিচার করি তাহলে মনে হবে যে, রোমান্টিক কবিতা লেখেন— এমন কবির সংখ্যাই বেশি। ১৯৫০-এ 'সমকালীন বাংলা কবিতা' নামে একটি আধুনিক কবিতা-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন সুহৃদ রুদ্র। কেবলমাত্র চল্লিশের কবিতাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো সংকলনটিতে। সংকলিত কবিতাগুলির নিরিখে যে-ভূমিকাটি সুহৃদ রুদ্র লিখেছিলেন, তাতে বলা হয়েছে রোম্যান্টিক কবিতার প্রাচুর্যের কথাই— "ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে,

বিষয়বস্তুর প্রবণতায় বিগত দশ বছরের কবিতা সমষ্টিগতভাবে যেন বিশেষ একটি প্রজ্ঞাপরিমিতির পথে সতত অনুসন্ধানে ব্যস্ত। এঁরা তথাকথিত আধুনিক নন। এবং, সাহসের সঙ্গেই বলা যেতে পারে, এঁদের আনুগত্য কবিমানসের অন্তর্মুখীনতার প্রতি যতটা, ততটা বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রকৃতিনির্ণয়ে নয়।" (সমকালীন বাংলা কবিতা, ১৩৫৭)। বিশেষভাবে চল্লিশের কবিতার রোম্যানটিকতার কথাও বলা হয়েছে এই ভূমিকাটিতে— "আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর আরো একটি উদ্ধৃতি এই সঙ্গে লক্ষ্যণীয় : 'আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে রোমান্টিক মনোভাব...অন্তর্ধানের পথে চলেছে।' সমকালীন বাংলা কবিতা সম্বন্ধে কিন্তু এ বিশ্লেষণ প্রযোজ্য নয়, বরং এই সংকলন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবে, রোমান্টিক মনোভাব আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে..." (পূর্বোক্ত)। একটু অবাকই লাগে একারণে যে, আজ আমরা চল্লিশের কবিতার সমাজমুখিতার দিকটিকেই বড় করে দেখি অথচ সমকালের ভাবনা বোধহয় একটু অন্যরকম ছিলো। সংকলনটিতে স্থান পেয়েছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ। তা সত্ত্বেও চল্লিশের কবিতা যে প্রধানত রোমান্টিক এবং 'সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি-নির্ণয়ে ব্যস্ত' নয় একথা ভেবেছিলেন প্রকাশক ও সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে একমত না হলেও হয়তো এটা বলা যায় যে, চল্লিশের দশকের কবিতায় যে সমাজমনস্কতার দিকে এখন আমরা অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকি পঞ্চাশের দশকের প্রারম্ভে ঠিক ততটা গুরুত্ব দেওয়া হতো না। কাজেই হয়তো এটাও বলা যায় যে, পঞ্চাশের দশকের কবিতার ব্যক্তিগত মনোভূমিতে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্চরণ কিছুটা চল্লিশের কবিতার প্রতিক্রিয়ায় হলেও অনেকটাই চল্লিশের অনুসরণও।

পঞ্চাশের কবিতার বিবর্তনের রূপটি আমরা এবার একটু দেখতে পারি।

কবিতাকে প্রাধান্য দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের আদর্শ পঞ্চাশের তরুণ কবিদের সামনে ছিলোই। ছিলো 'কবিতা' এবং আগে উল্লেখিত হয়েছে 'একক'-এর কথাও। পঞ্চাশের দশকের কবিতার যাত্রা শুরু হলো তরুণ কবি আলোক সরকারে কাব্যগ্রন্থ 'উতল নির্জন' দিয়ে এবং পরের বছরই আলোক সরকার ও তাঁর দুই বন্ধু—দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ও তরুণ মিত্র একত্রে প্রকাশ করলেন 'শতভিষা' (১৯৫১)—পঞ্চাশের দশকের কবিদের প্রথম নিজস্ব

কবিতা-পত্রিকা। ষোলো পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার ঠিক পরে পরেই এই জাতীয় আরো কয়েকটি পত্রিকাও দেখা দিলো। রোহীন্দ্র চক্রবর্তীর 'কবিতাপত্র'; সত্যেন্দ্র আচার্য, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'সব শেষের কবিতা' ভূমেন্দ্র গুহরায়, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, পরে জগদিন্দ্র মণ্ডলের 'ময়ূখ'; দু'বছরের মাথায় 'কৃত্তিবাস' ও তারপর অসংখ্য। অবাণিজ্যিক, অরাজনৈতিক, ছোটো কবিতাপত্রিকা প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের যে-চেহারাটা আমরা এখনও দেখি, পঞ্চাশের দশকেই তার শুরু। মনে হয়, শান্ত কিন্তু অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই এই পরিস্থিতির কারণ। অনেকেই নিজের কথা বলার জন্য ক্ষুদ্র হলেও নিজের একটি মঞ্চ চেয়েছিলেন।

'শতভিষা'র আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে পরবর্তীকালে আলোক সরকার লিখেছেন— "বুদ্ধদের বসুর 'কবিতা' সেই ধরনের কবিতা বিষয়েই পক্ষপাত প্রমাণ করতো যা তিরিশের দশকের কবিদেরই প্রতিধ্বনি, নতুন কোনো কাব্য-আন্দোলন যে শুরু হতে পারে এমন ধারণা 'কবিতা' পত্রিকার ছিলো না। এই অবস্থায় 'শতভিষা' যা আধুনিকতাকে প্রবহমানতার অর্থেই এক দিক থেকে গ্রহণ করেছিলো, তার প্রকাশ যে বিশেষ প্রয়োজনের ছিলো সেটা বুঝতে পারা যায়।" (শতভিষার পঁচিশ বছর ; শতভিষা, রজতজয়ন্তী বর্ষ, ১৩৮৩)। 'শতভিষা'র প্রথম সংখ্যার শেষে 'পূর্বরঙ্গ' নামে যে ছোটো ভূমিকা-জাতীয় গদ্যরচনাটি দীপঙ্কর দাশগুপ্ত লিখেছিলেন তাতে অবশ্য শুধু এই কথাই ছিলো যে 'রসোত্তীর্ণ' কবিতাকেই তাঁরা মর্যাদা দেবেন। তার বিষয় 'চাঁদ-ফুল-পাখি' অথবা 'মিছিল-ধর্মঘট'—যা-ই হোক। কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি একে বলা যায় না, কিন্তু পঞ্চাশের কবিতার মূল চরিত্র-লক্ষণ শেষ পর্যন্ত সম্ভবত এই-ই হয়ে দাঁড়ায়—এই সর্বগ্রাহিতা।

'শতভিষা'র প্রথম দিকের সংখ্যাগুলি দেখলে বোঝা যায়— প্রবীণ ও নবীন—সব কবিদেরই লেখা প্রকাশিত হতো সেখানে। সব মনোভাবের কবির কবিতা থাকতো। চীনা ও পোর্তুগিজ কবিতার অনুবাদ, বুদ্ধদেবের বোদলেয়র-অনুবাদের অংশ, অজিত দত্তের করা প্রাকৃত কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। শতভিষার দু'বছর পরে যখন 'কৃত্তিবাস' প্রকাশিত হলো তখন সেখানেও আধুনিকতা বিষয়ে নতুন কিছুই বলা হলো না। একই কবিগোষ্ঠী ঘুরে ফিরে লিখতেন দুটি পত্রিকায় এবং অন্যান্য পত্রিকাতেও। পরে, ষাটের দশকের প্রারম্ভে কৃত্তিবাসে প্রাধান্য পেতে শুরু করলো

শারীরিকতার প্রতি কিছু বিশেষ ঝোঁক। ইন্দ্রিয়ময়তার প্রতি এই পক্ষপাতের বিরুদ্ধে আলোক সরকার লিখিতভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন 'শতভিষা'-তে— "...কিছু কবি কবিতায় আবার প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতায় ফিরে যেতে চাইছেন। যা কিছু প্রাকৃতিক সত্য, যেমন আমাদের যৌনকামনা, বস্ত্রের অন্তরালে আমাদের শরীর, সকল অর্জিত সংস্কৃতি-সভ্যতার শাসনের ঊর্ধ্বে আমাদের হিংস্র লোলুপ স্বার্থপর কামুক প্রবণতাগুলির উচ্চারিত বিজ্ঞাপনিক তালিকা রচনায় তাঁরা উদ্বাস্ত।" (শতভিষা, সংকলন ২৯, ১৩৬৯)। 'শতভিষা' এই ঝোঁকটি পরিহার করেছিলো। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষের দিক পর্যন্ত 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সুস্পষ্ট বা ঘোষিত পার্থক্য কিছু ছিলো না। তবু সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য অনুভব করা যায়। 'কৃত্তিবাস'-এ প্রেমের কবিতা, আত্মবৃত্ত কবিতা, ইন্দ্রিয়-সংবেদনাময় কবিতা স্থান পেতো একটু বেশি। 'শতভিষা'-তে যেন দেখা যেতো সেই সব কবিতার আধিক্য যা মানুষের চৈতন্যলোকে পৌঁছতে চায়। আলোক সরকার মনে করেন চৈতন্যের অ-প্রাকৃতিক উজ্জীবনই কবিতার লক্ষ্য। তাঁর সেই মনোভাব সূক্ষ্মভাবে একটু ছাপ ফেলেছিলো 'শতভিষা'-র কবিতায়, যেহেতু তিনি ছিলেন 'শতভিষা'-র অন্যতম কবিতা-নির্বাচক। আর 'কৃত্তিবাস'-এর প্রধান নির্বাচক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেহেতু সে ধরনের কোনো লক্ষ্যে বিশ্বাস করেন না— তাঁর নির্বাচনে মানুষের মৌল স্বভাবজ কবিতার স্থান ছিলো বেশি।

সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে দুই তরুণ কবি— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক মজুমদারের যোগাযোগের ফলে প্রকাশ পেলো 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। সমকালের আর এক পরিচিত তরুণ কবি আনন্দ বাগচী যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। তিন সম্পাদকের নামাঙ্কিত ও দিলীপকুমার গুপ্তের আনুকূল্যে সমৃদ্ধ নতুন কবিতা-পত্রিকাটি দ্রুত সমকালের তরুণ-কবিদের প্রিয় হয়ে উঠলো। কিছুদিন পর্যন্ত 'কৃত্তিবাস'-এর প্রচ্ছদে ঘোষিত হতো 'তরুণতম কবিদের মুখপত্র'। কবিতা বিষয়ক আর কোনো দাবি পত্রিকাটি করেনি। তবে পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন যে আপনা থেকেই 'কৃত্তিবাস'-এর কবিতার একটি চরিত্র গড়ে উঠেছিলো। "কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিরা নিজেদের মধ্যে কোনরকম পরামর্শ না করেই যে নতুন রীতিতে কবিতা লিখতে শুরু করে তাকে বলা যেতে পারে স্বীকারোক্তিমূলক

কবিতা। এই কবিতা শুধু সৌন্দর্যের নির্মাণ নয়, রূপকল্পের সন্ধান নয়, এই-সব কবিতা যেন তাদের রচয়িতাদের জীবনযাপনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।" (ভূমিকা, কৃত্তিবাস সংকলন ১, ১৩৯১)। 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম সংখ্যাগুলির সঙ্গে যে-সব কবির সংযোগ ছিলো ঘনিষ্ঠ তাঁরা সকলেই অবশ্য নিজেদের কবিতাকে আলাদা করে 'স্বীকারোক্তিমূলক' বলতে চাইবেন বলে মনে হয় না। আবার কেউ কেউ হয়তো চাইবেন। 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম কয়েক বছরের যে-সব কবিতা দেখেছি—অর্থাৎ পঞ্চাশের কবিদের রচিত প্রথম ছয়-সাত বছরের যে কবিতা—তাতে সেগুলিকে আলাদা করে 'স্বীকারোক্তি-মূলক' বলার কোনো কারণ পাইনি। তবে ব্যতিক্রম থাকলেও 'কৃত্তিবাস'-এ ব্যক্তিগত সুরের কবিতা— প্রেম, বিষাদ, আকাঙ্ক্ষা ও উল্লাসের কবিতা কিছুটা বেশি স্থান পেতো। তাকেই 'স্বীকারোক্তিমূলক' বা অনেকে যেমন বলেন— 'আত্মজৈবনিক' বলা যেতেও পারে।

এরই ফলে দিনে দিনে 'কৃত্তিবাস'-এর অনেক কবিতার রূপ হয়ে দাঁড়ালো কিছু বেশি মাত্রায় শরীরী। যে-শিল্প কেবলমাত্র শিল্পীর আত্মকেন্দ্রিক ভুবনটিকে ঘিরেই আবর্তিত হতে চায় সে-শিল্পের শরীরমূলক— এমনকি যৌনতামূলক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। যেখানে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে নিজের মন, নিজের অনুভূতি—সে অনুভূতি প্রায়ই হয় শরীর-জাত, ইন্দ্রিয়বেদ্য। যে-মন সমাজমুখী হতে চায় না, তার কাছে অধিকাংশ অভিজ্ঞতা আসে আত্মরতির পথ ধরে—যার অন্যতম একটি উৎসারণ যৌন-অনুভবে। ইউরোপীয় সাহিত্যেও ঘটেছে এমন। প্রেমের সঙ্গে শরীর-চেতনার সংযোগ কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু এজাতীয় সাহিত্যে যৌনতার অনুভব প্রেমবোধের পথ ধরে আসে না। বরং আসে প্রেমহীন শরীরী বোধের পথ ধরে। সেজন্যই তাকে মনে হয় এত উচ্চকিত, নিম্ন-রেখা দিয়ে এত স্পষ্টীকৃত করা। প্রেমবোধের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে এজাতীয় কবিতায় যৌন চেতনার প্রকাশ অনেক সূক্ষ্ম ও কোমলভাবে এসেছে। কিন্তু অনেক কবিতায় প্রেম-অনুভব ব্যতিরেকেই শরীরজ ক্রিয়া ও বিক্রিয়াগুলির কিছু অনতিমার্জিত ভাষারূপ কবিতাগুলিকে দিয়েছে একটু বেশি শারীরিকতা। সেই শারীরিকতার পথ ধরে কবিতায় যখন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছাড়া অন্যতর কোনো চেতনার আভাস পাওয়া যায়নি তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অকারণে অশোভন হয়ে ওঠাই এই কবিতা-

গুলির স্পর্ধিত লক্ষ্য। তবু ও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় পঞ্চাশের দশকের একেবারে শেষের দিকে ও ষাটের দশকের প্রথমার্ধে তিন কি চারজন কবির কলমে দেখা গিয়েছিলো এজাতীয় কবিতার একটি সাময়িক আবর্তন।

প্রেমের কবিতাগুলিতে যৌনচেতনার প্রকাশের একটি সামাজিক কারণও থাকতে পারে। নারী ও পুরুষের মেলামেশার সম্পর্কের জড়তা পঞ্চাশের দশকে অনেকটা কমে গেলেও কোনো অর্থেই বাঙালি সমাজে তা মুক্ত সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি। বস্তুত এখনো ভারতীয় সমাজে যৌন স্বাধীনতার ক্ষেত্র অত্যন্ত নগণ্য। অথচ পশ্চিমী চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে নারী-পুরুষ সম্পর্কের মুক্ততা মনের একটি চাওয়ায় পরিণত হয়েছে। তারই একটি পরোক্ষ ফল হয়তো কবিতায় যৌন-চেতনার ঐ প্রকাশ। তবু পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ কবি ও অনেক কবিতা সম্পর্কেই যৌন-চেতনার আতিশয্যের দাবিটি যথার্থ নয়।

পঞ্চাশের দশকের কবিতা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনায় কিন্তু প্রতিফলিত হবে না পঞ্চাশের প্রধান কবিদের কবিতা-বিষয়ক চিন্তা ও রচিত কবিতার পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলি। কবিতার সঙ্গে নিবিড়তর যোগ স্থাপন করলে তবেই পাঠকের পক্ষে সে পার্থক্যের মাত্রা অনুভব করা সম্ভব। তবু সামান্য কয়েকটি কথার মধ্যে এখানে একটু আভাস দেবার চেষ্টা করছি।

"সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার"— শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় ১৯৬৯-এ একথা বলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। ১৯৮১-তেও একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর উক্তি— "এক সময়ে লিখেছিলাম যে সত্যি কথা বলাই হলো কবিতার একমাত্র কাজ। যথার্থ কবিতার স্বরূপ বলতে এইটেকেই বুঝি আমি এখনো। কিন্তু সত্যি কথা যে কাকে বলে সেই নিয়েই মুশকিল। আমাদের একটা ব্যক্তিগত সত্য আছে, সমাজের সত্য আছে, গোটা জীবনেরও কোনো সত্য প্রচ্ছন্ন আছে কোথাও। তিনদিক থেকে এসে কোনো-এক বিন্দুতে এদের সংঘর্ষ হয় একটা, আর সেটাই হয়ে ওঠে কবিতার সত্যের মুহূর্ত।" (ক্ষুধার্ত ৬, ১৯৮১)। এই অংশটি পড়লে মনে হতে পারে বেশ দুরূহ ধরনের এক সত্য-সন্ধান শঙ্খ ঘোষের অন্বিষ্ট যার মধ্যে আছে বিভিন্ন সত্যের এক সংঘাত ও সেই সংঘাত-উত্তরণের পরম মুহূর্ত। এতখানি দার্শনিকতা ঠিক যেন পঞ্চাশের কবিতার প্রধান সুরের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের আরো কবিতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ থেকে ক্রমে মনে

হয়— এই সত্য কোনো দার্শনিক সত্য নয় ততটা— কবি সম্ভবত নিজের হৃদয়ের সত্যটিই ছুঁতে চাইছেন—"তোমার কোনো ধর্ম নেই তখন/প্রহরজোড়া ত্রিতাল শুধু গাঁথা—/মদ খেয়ে তো মাতাল হতো সবাই/কবিই শুধু নিজের জোরে মাতাল!" (ত্রিতাল, প্রহর জোড়া ত্রিতাল, ১৯৮২)। আবার আত্মনিমগ্ন এই আবেগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াও কবি শঙ্খ ঘোষের একমাত্র ধর্ম নয়। এ ব্যাপারে সরাসরি পঞ্চাশের দুই প্রধান কবির বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন— "এঁরা দুজনেই (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়) দেখাতে চান যে সচেতন বুদ্ধির কোনো পরিচালনা ছিল না তাঁদের সৃষ্টির অভিজ্ঞতায়। বুদ্ধি থেকে পালিয়ে আসার এই জাঁক, এই আকাঙ্ক্ষা— এ কি তাঁদের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় কেবল, না এর মধ্যে লুকোনো আছে যুগেরই একটা ধরন?" এই বুদ্ধির বর্জন যে যুগের ধরন তা স্বীকার করেননি শঙ্খ ঘোষ। ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন—"কেবল, আধুনিক কাল চায় যে এই মুহূর্তের মধ্যে মিশে যাক হৃদয় আর মেধা একসঙ্গে।" (ঈশ্বরের এক মুহূর্ত, শব্দ আর সত্য, ১৯৮২) এই মেধার শাসন ও বুদ্ধির সচেতনতা কখনই শঙ্খ ঘোষের কবিতাকে ছেড়ে যায়নি। কিন্তু তিনি সব সময়েই চেষ্টা করে এসেছেন যাতে হৃদয়ের সত্যের সঙ্গে মিশে যায় এই মননের উজ্জ্বলতা। তাঁর কবিতা এই মিলনের প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত। শঙ্খ ঘোষ অবশ্য একাধিক প্রবন্ধে পঞ্চাশের দশকের কবিদের আত্মজৈবনিক প্রবণতা, প্রেরণাবাদী চিন্তবৃত্তি—এগুলিও স্বীকার করেছেন। 'রুচির সমগ্রতা' প্রবন্ধে বলেছেন কবিতার বিচিত্র আকাশের কথা—বলেছেন বিভিন্ন ধরনের কবিতার প্রতিই নিজের ভালো লাগার কথা। পঞ্চাশের দশকে যে-সব কবিতা শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যেও বাইরের পৃথিবী ও ব্যক্তিগত জগৎ— দুইয়েরই রূপ-রস অনুভব করা যায়। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন— "এ-দুই কি ভিন্ন নাকি? এ-দুয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করেই কি বেঁচে নেই মানুষ? তার থেকেই কি প্রতিমুহূর্তে তৈরি হয়ে উঠছে না একটা তৃতীয় ভুবন?" (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৯)। শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় এই তৃতীয় ভুবনের অন্তরতর সত্যটিই স্পর্শ করতে চান বলে মনে হয়।

"আমরাই বোধহয় 'কৃত্তিবাস' ও 'শতভিষা' কবিপত্রের লক্ষ্মীছাড়ার দল— শুরু করে দিয়েছিলাম অ-তাত্ত্বিক (non-ideational) কবিতা লিখতে।" —বলেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর নিজের সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধে

(দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯)। কিন্তু সেই সুপ্রসর প্রবন্ধটিতে অলোকরঞ্জন তাঁর নিজের জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতার অর্জন নিজের কবিতার উৎসভূমিতে রস সঞ্চার করেছে বলে মনে করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার বৃত্তে শৈশব-কৈশোরের সুশীলিত 'শিল্প-সংসার,' শান্তিনিকেতনে 'সুন্দরভাবে বয়ে যেতে' শেখা, সাময়িকভাবে রাজনীতির সংস্পর্শে 'সদা অর্জিত স্বাধীনতাকে অস্বীকার' করা, বীরভূমের গ্রামগুলিকে 'নখদর্পণে' রাখা, নাগরিকতা এবং ঈশ্বরানুভব—এই সব কিছুর উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায়, কবিতার একান্ত আত্মকেন্দ্রিকতায় তাঁর আস্থা নেই। কবিতার হয়ে ওঠার বিষয়ে তিনি বলেছেন "এই হয়ে ওঠার অর্থ একদিক থেকে সামাজিক সত্তাকে উৎসর্জন করা, অন্যদিকে রহস্যতোরণের কাছে আজানু প্রার্থনা।" (দেশ, পূর্বোক্ত)। ভাষাটি ভিন্ন হলেও শঙ্খ ঘোষের কবিতার উৎস-ধারণার সঙ্গে অলোকরঞ্জনের খুব বেশি পার্থক্য হয়তো নেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথিত 'স্বীকারোক্তি' বা বহু উক্ত 'আত্মজৈবনিকতা' সম্পর্কেও অলোকরঞ্জন কিছু সতর্ক— "আত্মবিবরণী অথবা আদর্শ বিবৃতির পথে না গিয়ে পাঠকের সঙ্গে আমি আড়াআড়ি অথচ নিবিড় আত্মীয়তা চেয়েছি।" (পূর্বোক্ত)। মনে হয় না যে, পাঠকের সঙ্গে আড়ালহীন কোনো সংযোগ স্থাপনে অলোকরঞ্জন আগ্রহী। আবেগের সঙ্গে মননের কারুকাজ ও অধ্যয়নজাত বৈদগ্ধ্যের ছাপ তাঁর কবিতায় ঈষৎ কাব্যময় আড়াল রেখেই দেয়—অনেক পাঠকেরই এ অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাপাঠে। 'শতভিষা' পত্রিকার পঞ্চাশতম সংকলনে একটি সাক্ষাৎকারে অলোকরঞ্জন বলেছিলেন যে পঞ্চাশের কবিরা প্রবলভাবে অধ্যয়নস্পৃহ ছিলেন। ঐ সাক্ষাৎকারেই অলোকরঞ্জন কবিতা সম্পর্কে যা বলেছেন তাতেও মনে হয় আত্মবৃত্ততার মধ্যেই কবিতার সত্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে তিনি অনাগ্রহী— "কবি-অভিজ্ঞতার প্রধান ভিত্তিই তো ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা।...সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভার যদি ঝরিয়ে না দেওয়া যায় তাহলে কবিতার উত্তরণ হতে পারে না।" (শতভিষা, শরৎ, ১৩৮৯)।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতার ক্ষেত্রে প্রেরণাবাদী। ..."কবিতা রচনাকালে আমি যেন স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে পালিয়ে থাকি। কবিতা লেখার সময়টায় আমি ঠিক শক্তি চট্টোপাধ্যায় নই। ...কবিতা লেখার সময়টায় আমি খুব 'ডিপলি রিলিজিয়াস'। তখনকার ক্ষমতার সংগে বাইরের

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বাভাবিক ক্ষমতার একটা তফাৎ ঘটে যায়।..."(অন্বীক্ষণ, দশম সংকলন, ১৩৭৫)। কবিতায় যে কবি নিজেকেই খুঁজে পান একথাও তিনি জানিয়েছেন— "আমার নিজের কাছে, একাকীর কাছে, কবিতা অবলম্বন। নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পণ এক।" (ভূমিকা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৭৩)। কিন্তু কবিতার নির্মাণ যে সম্পূর্ণ অসচেতনভাবে সম্পন্ন হয় এমন কথা বলেননি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বরং মাঝে মাঝে বলেছেন বিপরীত কথাই। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'যম'—'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো। তিনি নিজেই লিখেছেন যে, সেটি হিসেব মিলিয়ে খাড়া করা একটি সনেট। অন্যত্র বলেছেন—"শুনেছি বাসে যেতে যেতে কারো কারো কবিতার লাইন নাকি হঠাৎ মাথায় আসে। আমার কিন্তু সেরকম হয় না। এখন সচেতনভাবে কিছু ছবি আমি আগে তৈরী করতে চেষ্টা করি।" এবং ঐ প্রবন্ধেই— "শব্দটা ঠিক যথাযথ ওজনে বসানো হোল কিনা এ ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবায়।" (অন্বীক্ষণ, পূর্বোক্ত)। মনে হয় না যে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজের কবিতা সম্পর্কে যা-কিছু বলেছেন বা লিখেছেন—সবই সবসময়ে গুরুত্বের সঙ্গে বা দায়িত্ববোধের সঙ্গে করেছেন। তাঁর কবিতা-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমাদের যেতে হবে তাঁর কবিতার কাছেই। তাঁর কবিতা থেকে আমার মনে হয়েছে—কবিতা বিষয়ে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতামত নেই। যে-কোনো অনুভূতিকেই যে-কোনো সময়ে কবিতায় তিনি রূপ দিয়ে থাকেন। কবিতার ব্যঞ্জনায় একটু রহস্য একটু অস্পষ্টতা রাখার ব্যাপারটা তাঁর হাতে খুব ভালো খোলে। খুব গভীর কোন অর্থের উন্মোচন নেই অথচ অনুভূতির পাতাটিতে নানান রকম সূক্ষ্ম রঙিন নক্‌শা— সেই নক্‌শার রূপটি তিনি ভারি যত্নে এঁকে তোলেন— খুব যত্ন করে একটু রহস্য রেখে দেন—এভাবেই তাঁর কবিতা আমাদের মন কেড়ে নেয়। কিন্তু কবি সব সময়েই সেরকম কবিতা লিখে উঠতে পারেন না। সুস্পষ্ট অর্থময় কবিতাও তিনি অনেক লিখেছেন—তার কোনো কোনোটি চমৎকারভাবে উৎরেও গেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়—মানুষ ও প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও ঈশ্বরানুভব, অস্তিত্বের কিছু অ-ধরা ব্যঞ্জনার স্পর্শ পেয়েছি। কিন্তু বিশেষভাবে স্বীকারোক্তি বা আত্মজৈবনিকতার লক্ষণ পাইনি— যদি না এই সব কিছুকেই বলা যায় আত্মজৈবনিক। শেষ করার আগে বলা যায় যে, তিনি মনে করেছেন—"ভালোবাসা থেকেই বেশি ভাল কবিতার জন্ম হয়।"

(অন্বীক্ষণ, পূর্বোক্ত)।

"আমার নিজের ধারণা কৃত্তিবাসের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার কৃত্তিবাসের সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে।" বলেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সহযোগী কবি-বন্ধু শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কৃত্তিবাস, সংকলন ২৫, ১৯৬৮)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কিত মতামত খুব স্পষ্ট করে তিনি কোথাও প্রকাশ করেছেন কিনা জানি না। কবিতা-বিষয়ক রচনাকে তিনি অবশ্য খুবই স্পষ্ট ভাষায় 'অপাঠ্যতম' 'দুর্বোধ্য' 'খটমটে', 'কৃত্রিম' ও 'বুদ্ধির ব্যায়াম' বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—এইসব রচনা কবিতার মধ্যে থেকে 'একটা আপাত দার্শনিকতা খোঁজার চেষ্টা' করে। সবশেষে তাঁর মন্তব্য—"কবিতার পবিত্রতা কবিতার ব্যাখ্যায় ঝলসে যায়।" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯)। 'পবিত্রতা' জাতীয় শব্দ কবিতা সম্পর্কে তিনি ব্যবহার করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে এতবার কবিতা রচনা বিষয়ে কবির দুঃখবোধ, উত্তেজনা, বিস্ময়, আকস্মিক উদ্ভাসন ও রহস্যের কথা বলেন যে মনে হয়, সত্যিই কবিতার উৎসমূলে নিহিত এক প্রেরণায় তাঁর অসংশয় আস্থা আছে। কিন্তু এতো গেল কবিতার উৎস বা জন্ম বিষয়ে কবির অনুভূতি। কবিতার অবলম্বন বা বিষয় নিয়ে তিনি কি কিছু বলেছেন ? 'কৃত্তিবাস' ও তার কবিদের নিয়ে যখন তিনি কিছু লিখেছেন তার মধ্যে থেকেই কবিতার বিষয় সম্পর্কে তাঁর কিছু ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কৃত্তিবাস'-এর চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্ম-সংখ্যায় (১৩৬১) 'কৃত্তিবাসের একবছর' নামে একটি লেখায় দেখা যায় যে তিনি রাজনীতি বা যুদ্ধকে কবিতার বিষয় হিসেবে অ-পছন্দ করছেন এবং পছন্দ করছেন প্রেমের কবিতা। কিন্তু এক বছরের 'কৃত্তিবাস'-এর প্রেমের কবিদের সম্পর্কে লিখেছেন—"এঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কৃতী। কিন্তু যৌবনের উত্তাপ যেন কারুরই লেখায় লাগেনি।" প্রেমের কবিতায় 'রক্ত-মাংসের উত্তাপ' চাইছেন তিনি। 'কৃত্তিবাস'-এর কবিরা যে নিজেদের ব্যক্তি-গত জীবনকে কবিতায় তুলে আনেন—এ মতটি প্রধানত তাঁরই। পঞ্চাশের দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রেম, বিষাদ বা মানসিক অভিজ্ঞতার দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ষাট বা সত্তরের দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে এমন কথা বলা যায় না। সরাসরি সমাজমনস্ক ভাবনাও তাঁর কবিতায়

দেখা গেছে অনেক। সম্ভবত তিনিও মনে করেন না যে, কবিতার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় আছে। তবে কবিতার উৎস রূপে একটি ব্যাখ্যাহীন প্রেরণার কথা হয়তো এখনও তিনি বলবেন— এখনও হয়তো স্পষ্টভাবে স্বীকার করবেন না কবিতার আবেগে মেধা ও মননের মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা। যদিও তাঁর কবিতা-রূপের নিপুণতাই ব্যক্ত করে দেয় তাঁর রচনায় মননের অনুশাসনের দিকটি।

পঞ্চাশের দশকে প্রায় সমস্ত কবিতা-পত্রিকাতেই কবিতা লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। এখনও তাঁর কবিতা-স্রোত বহমান পঞ্চাশের অন্য কবিদের মতোই। কবিতায় ব্যক্তিগত জীবন বা বহির্জীবনের কোনো ভেদ-রেখা তাঁর কাছে বড় নয়। দুইয়ে মিলেই জীবন—জীবনের সম্পূর্ণতা এবং কবিতার প্রস্থানভূমি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন— "একদিকে এই আমি এবং অন্যদিকে বহির্জগৎ। মানে, কম্পমান এক সাঁকো, নিচে জল, ওপর দিয়ে হাঁটছি। তার ডানদিকে গেলে আমি নিজের কাছাকাছি চলে যাই। বাঁদিকে গেলে বহির্জগতের কাছে। মাঝখানে থাকলে মাঝামাঝি। দুটোই আমার কাছে সমান মূল্যবান, হয়তো বেশী থাকছি একদিকে।" (শতভিষা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৬)। কবির মনোলোকে দুই ভুবনের সংযোগ মেনে নিলেও প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটিতে একদিকে বেশি থাকার কথা বলেছেন। পরেও বলেছেন— কবিতাকে যদি 'আহরিত' ও 'উৎসারিত' এই দুইভাগে ভাগ করা যায় তাহলে তাঁর কবিতা 'উৎসারিত' কবিতার মধ্যে পড়বে। আর এক জায়গায় বলেছেন ঐ সাক্ষাৎকারেই— "আমার কবিতার সমাজসচেতনতা প্রচ্ছন্ন, শঙ্খ ঘোষ বা অন্য অনেকের কাছে তা প্রকট, আমার কবিতায় সমাজসচেতনতা রসায়ন হিসেবে মিশে থাকে বলেই সবসময়ে আলাদা করে সব বর্ণ চেনা যায় না।" শঙ্খ ঘোষের কবিতার সঙ্গে তিনি যে নিজের কবিতার তুলনা করেছেন সমাজসচেতনতার প্রত্যক্ষ প্রকাশের ব্যাপারে— এর থেকে বোঝা যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ব্যক্তিগত মনের প্রচ্ছায়াকেই সম্ভবত প্রধান করে দেখাতে চান তাঁর কবিতায়— যদিও অস্বীকার করেন না অন্যতর বিষয়ের অস্তিত্বের দিকটাও। কবিতার বিষয় বলতে তিনি— যা-কিছু মনকে আলোড়িত করে, জীবনবোধকে স্পন্দিত করে— তাকেই বোঝেন, আর, প্রবহমান-তাকেই মনে করেন আধুনিকতা। "কবিতা তথা সমস্ত সাহিত্যের মূল উৎস

হলো জীবন।...সাহিত্য জীবনের উন্মীলন, জীবনের অনেক অন্তঃশীল যোগ-সূত্রের উজ্জ্বল উন্মোচন।" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৭) বলেছিলেন প্রণবেন্দু নিজের কবিতা বিষয়ে বলতে গিয়ে। বলেছিলেন—"কবিতা, আমার মতে, অনুভূতিময় সত্যভাষণ।"

পঞ্চাশের দশকে ছিলেন আরো অনেক কবি। অরবিন্দ গুহ, আনন্দ বাগচী, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, সুধেন্দু মল্লিক, মানস রায়চৌধুরী, সুনীল বসু, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন, দিব্যেন্দু পালিত। কবিতা-বিষয়ক যে কয়েকজনের ভাবনা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়েছে সেই ভাবনাগুলিরই কোনো-না-কোনোটির সঙ্গে সম্ভবত অনেকটা মিলে যাবে এইসব কবিদের কথা। হয়তো সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ভাবেন। মানস রায়চৌধুরী ও সুধেন্দু মল্লিক ভাবেন শঙ্খ ঘোষ ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের মতো, আরো কয়েকজন কবির নাম করা হলো না। কিন্তু নামের তালিকা নিখুঁত করার জন্য প্রবন্ধ লেখা নিরর্থক।

পঞ্চাশের দশকের একজন কবির কাব্যভাবনা কিন্তু ছিলো অন্য সব কবির চেয়ে আলাদা। তিনি আলোক সরকার। শিল্প তাঁর কাছে—"অলৌকিকের নির্মাণ—সচেতন জাগ্রত নির্মাণ।" তিনি বলেন— "সত্য যা তা লৌকিক, আবেগ ইন্দ্রিয়গত অভিভাব লৌকিক, ব্যবহারিক জীবনের অভাব-অনটন, প্রত্যাশা-ব্যর্থতা সবই লৌকিক, এদের হয়ে-ওঠার একটা স্বতঃস্ফূর্ত, সংস্কার-আবদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ রীতি আছে, সত্য এবং স্বাভাবিক রীতি। এই রীতিকে মেনে নিতে হয় কিন্তু সেই মেনে নেওয়ার ভিতরে ব্যক্তিত্বের সেই ঘোষণা নেই যা শিল্প প্রয়াসকে প্রকৃত ধারাবাহিকতার উপর স্পষ্ট করে। শিল্পীর সাধনা তাই মিথ্যার সাধনা, অলৌকিকের সাধনা—সেই মিথ্যাকে প্রাকৃতিকতার সহজ এবং স্বাভাবিক রীতিগুলির নতুন বিন্যাস অভিনব সংস্থাপনের ভিতর দিয়েই পেতে হয়। কবিতার নির্মাণ বলতে আমি এই মিথ্যাকে অর্জন করার তাগিদটাই বেশি করে বুঝি।" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৭) দীর্ঘদিন ধরে এই কাব্যতত্ত্বে স্থিত আছেন আলোক সরকার। তিনি কবিতা থেকে বর্জন করতে চান ইন্দ্রিয়গত আবেগের তীব্রতা, যে-কোনো-রকম উচ্ছ্বাস এবং সামাজিক অভিঘাতসমূহ। তাঁর কাছে সচেতন শব্দ-বিন্যাসে শিল্পীর মনন-নির্যাসকে চৈতন্যের এক শুদ্ধ বিন্দুতে নিয়ে যাওয়াই

প্রকৃত শিল্প। শুদ্ধ শিল্পের এই ধারণা আমরা বোদলেয়র, মালার্মে, ভালেরি-র কাব্যচিন্তায় কিছুটা পেয়েছি। আলোক সরকারও স্বীকার করেন কবিতার শুদ্ধতার এই ভাবনায় মালার্মে তাঁকে কিছুটা প্রেরণা দিয়েছেন। এজাতীয় কবিতার বিষয়গত বৃত্তটি হয়ে পড়ে খুব সীমাবদ্ধ। এবং, যেহেতু সুর ব্যবহার করা যায় না—শব্দ-বিন্যাসের ও প্রতীক-চিত্র রচনার সাহায্যেই কবিকে সেই চৈতন্য-শিখাটি জ্বালিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়। কাজটি দুরূহ, সংশয়াতীতও নয়; সহজ ব্যাখ্যায় তো বোঝানোই যায় না। তা ছাড়া কবিকে একটা কিছু অবলম্বন করতেও হয়। আলোক সরকার মূলত অবলম্বন করেন নিসর্গকে—মানুষকেও। তারপর কবিতার ভাষায় সেই 'রূপ'-কে এক চৈতন্যময়তায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। তিনি অনেক সময়েই বিস্ময়কর সার্থকতা লাভ করেছেন কিন্তু পঞ্চাশের দশকে তাঁর সহযোগী কেউ ছিলেন না। ষাটের দশকে কেউ কেউ হয়তো তাঁর দ্বারা অংশত প্রভাবিত হয়েছেন।

সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশের দশককে যদি দেখা যায় শেষবারের মতো তাহলে একথা বলতেই হবে যে—রাজনীতিসচেতন ও প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-অভিমুখী কবিতায় এই দশক আকৃষ্ট হয়নি। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কবিরাও কবিতার আদর্শ যে সমাজমুখিতা একথা একান্তভাবে স্বীকার করেননি। কিন্তু অনেকে মনে করেন একান্ত ব্যক্তিগত, আত্মরতিমূলক সঞ্চরণই পঞ্চাশের দশকের কবিদের মূল লক্ষণ— একথাও ঠিক নয়। পঞ্চাশের কবিদের তিন কি চারজনই মাত্র এই প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সেই সময়ে। পরে তাঁদেরও কেউ কেউ সেই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

পঞ্চাশের কবিরা কেউ কেউ অনাবৃত শরীরচেতনা ও যৌনতাকে কবিতায় অভিব্যক্ত করেছিলেন— একথাও ঠিক, তবু তা অধিকাংশের সম্পর্কেই সত্য নয়, কয়েকজনের সম্পর্কেই সত্য। তারও প্রকাশ ঘটে-ছিলো ষাটের দশকে— পঞ্চাশের দশকে নয়। তার মূলে অনেকটাই ছিলো অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ-এর উপস্থিতির সাময়িক প্রভাব।

পঞ্চাশের কবিতায় বৈদগ্ধ্যের ছাপ ছিলো অঘোষিত। তিরিশের কবিতার প্রাকরণিক দিকটি কবির পাঠ ও জ্ঞানের জগতের ব্যাপ্তি নির্দেশ করতো। তা পাঠককে কাছে যেমন টেনেছে— তেমনি দূরেও ঠেলেছে।

বিদেশি কবিতার যে সুস্পষ্ট ছায়া দেখা যেতো তিরিশের কবিদের লেখায় তা-ও বর্জন করলেন পঞ্চাশের কবিরা। ইয়েট্‌স্‌, এলিয়ট্‌, বোদলেয়র, হুইট্‌ম্যান্‌, হপকিন্‌স্‌-কে পাশে রেখে পড়তে হয় না তাঁদের কবিতা—পড়বার কথা মনেও হয় না। সহজ ভাষা— কথ্য চালের স্পন্দনে কিন্তু লঘুতায় নয়, সারল্যে কিন্তু সরলীকরণে নয়—পঞ্চাশের কবিরা সফলভাবে নির্মাণ করেছিলেন কবিতার জন্য সমবেতভাবে। পরে অবশ্য অলোকরঞ্জনের মতো কেউ কেউ কিছুটা সরে গেছেন।

অথচ পঞ্চাশের কবিরা যে বিশ্বের কবিতার সামগ্রিক ভাবনা-চিন্তার জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন তা-ও নয়। কিন্তু সে ভাবনা গ্রহণ বা স্বীকরণের প্রশ্ন ওঠে না তাঁদের কবিতায়। তাঁরা সম্ভবত মিলিয়ে নিয়ে ছিলেন অভিজ্ঞতার স্তরগুলি। তাতেই বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছিলো তাঁদের কবিতা।

পঞ্চাশের কবিরা নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ছন্দের দিক থেকে। তিরিশ ও চল্লিশের কবিতার ছন্দ ও মিলের নিপুণ ঝঙ্কারে যখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমরা—অমিয় চক্রবর্তীর ভিন্ন সুরের ছন্দকে স্প্রাং রিদ্‌ম্‌, ফ্রী ভার্স—ইত্যাদি ধারণার সাহায্যে যখন গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি মাত্র—তখন পঞ্চাশের কবিরা অবলীলায় ছন্দ জেনে পৌঁছে গেলেন মাপা ছন্দের যান্ত্রিক ঝঙ্কার ছাড়িয়ে ছন্দস্পন্দের মোহন শ্রুতিময়তায়। তাঁদের কিছু সাহায্য নিশ্চয়ই করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং অমিয় চক্রবর্তীও। পঞ্চাশের কবিদের কাছে ভাষা ও ছন্দের কারণেই প্রিয় ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। তবু এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সাফল্য পঞ্চাশের কবিদেরই। এই প্রথম বাংলা ছন্দ-ভাবনায় যথাযোগ্য স্থান পেলো শ্রুতি ও উচ্চারণের দিকগুলি। প্রথম থেকেই পাঠকেরা যে এ-জাতীয় ছন্দ গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, অগ্রজ কবিরাও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বারবার। কিন্তু পঞ্চাশের কবিদের অনুত্তেজিত আত্মবিশ্বাস বাংলা কবিতার ছন্দকে একটি দুরূহ পর্যায় পার করে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পঞ্চাশের দশকের কবিতা-চর্চাই প্রকৃত অর্থে বাংলা আধুনিক কবিতাকে ছড়িয়ে দিয়েছে এক সুবিস্তৃত পরিসরে। মনন-অধ্যয়নের অধিকারী হলে কবি বা কবিতার পাঠক হওয়া যাবে; সমাজ-রাজনীতি-মনস্ক মানুষের

জন্যই কবিতা—এসব ধারণা অপসৃত হয়ে গেল এই সময়ে। কবিতা যেন হয়ে উঠলো—যিনি কবিতা ভালোবাসেন তাঁরই। কবিতার ওপর থেকে উঠে গেল আরোপিত সব বাধা-নিষেধ, নিয়ম-কানুন। শিল্পবোধই হলো কবিতার একমাত্র বিচারক। কবি ও পাঠকের সংখ্যা বেড়ে গেল হঠাৎ করে। এই স্বাধীনতা হয়তো সুযোগ দিয়েছিলো অনেক অনধিকার ও স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে। কিন্তু চিরকালই কালস্রোত অনধিকারীকে বর্জন করে। পঞ্চাশের দশকের কবিতা যেন সাজপোষাকে, অভিনবত্বে নয়—অনেক বেশি ভিতরের দিক থেকে কবিতা।

ঠিক এই মুহূর্তে কেউ কেউ পঞ্চাশের দশকের কবিতাকে বলতে চাইছেন অবক্ষয়ী আধুনিকতার কবিতা। মেধা ও মননচর্চার প্রতি পঞ্চাশের দশকের কবিদের কিছু আপাত-অনীহা, কিছুটা অসামাজিকতা, আত্মপ্রচার-প্রবৃত্তি এবং আবহমানের বাংলার লোকজ সংস্কার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তার অসংযোগই এই ধারণার মূলে। কিন্তু আগেই বলেছি—পঞ্চাশের কবিতা সম্পর্কে এসব ধারণাই আংশিক। কাল প্রমাণ করেছে যে মেধার সংযোগ বর্জিত কবিতা একালে শিল্প বলে গণ্য হতে পারে না এবং পঞ্চাশের কবিরা সকলেই অতীব সামাজিক, কেউই মূর্খ নন। যদিও পঞ্চাশের দশকের কবিতা লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে তেমন সংযোগ রাখেনি—একথা সত্য। তিরিশ বা চল্লিশের দশকের কবিতা কিন্তু এই ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছে। আবার এই ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনছেন সত্তর—বিশেষত আশির দশকের কবিরা।

কোনো পর্বের কবিতাকে অবক্ষয়ী যুগের কবিতা বলে ক্রুদ্ধ হওয়া নিরর্থক। অবক্ষয় নিহিত থাকে যুগে, শিল্পে নয়। সৎ-শিল্প সব সময়েই অবক্ষয়ের প্রতিবাদ। যা শিল্প নয় তা কালস্রোতে হারাবেই। আত্মপ্রচারে অ-শিল্পকে শিল্প করে তোলা যায় না। আবার, বিরুদ্ধ প্রচারেও সৎ শিল্প কালোত্তরণের পথেই এক ধাপ এগিয়ে যায়। পঞ্চাশের দশকের কবিতার বহুল অংশই বাংলা কবিতার প্রবাহমানতায় সম্পন্ন সংযোজন—আজ বোধহয় তাতে সন্দেহ করা যায় না।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

রাগ মারোয়া

জেগে ওঠে শৈলশিরা
মারোয়ার ঝটিকাবিস্তারে আছি একা
যোশীজী অদৃশ্য অন্ধকারে
মাথার ওপরে দোলে নক্ষত্রবলয়

কে চায় সংক্ষোভ এত কাছাকাছি
দ্রবহীন কর্কশ পৌরুষ
রুক্ষ পাথরতা
এ তীব্র মধ্যমে ফাটে হাহাকার কার ?

চোখ বন্ধ করে আমি হাঁটি মধ্যলয়ে

ক্রমে ফিরে আসে অবয়ব, ঠাণ্ডা হাওয়া
হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসে—কাঁধে কার হাত—
সামনে উপত্যকা গাছ, পক্ষ থেকে তার
ঘুরে ঘুরে ঝরে পড়ছে গুচ্ছ তারাফুল
ঘুরতে ঘুরতে ঝরে

গায়কের উত্তান আঙুলে
পারাপার শেষে স্তব্ধ দাসভাবে সময়বিজ্ঞান।

বিস্ফোটের মত জেগে থাকে

উল্টে উল্টে পড়ি
সংক্ষিপ্ত সময়-ইতিহাস
যা জানি যা ভাবি সত্য নয়
আমি যে দাঁড়িয়ে আছি তা নির্ভর করে
তালগাছ দাঁড়িয়েছে কিনা তার ওপরে

পা ফেলে পা ফেলে
ভূমিস্পর্শমুদ্রা, তুমি ভুল ?

সময়ের গা ঘেঁষে কি ব্যোম
দূরত্ব মাপার জন্যে আলোবর্ষ নিশ্চিত লণ্ঠন
হয়ে রইল। বাকি অন্য সব
এ যাবৎ চর্চিত বিশ্বাস—অহং ভ্রম—
ব্রহ্মাণ্ডবিলীন ওই মৃত নক্ষত্রের অনুপাতে

হুইল চেয়ারে বসে মহামতি হকিং সাহেব
স্মিতহাস
পরবশ পঙ্গুদেহ ধরে আছে মাথা
ওইগানে নির্ভুলগণিতপ্রণয়ন
শতাব্দকে আলিঙ্গন করে, ছুঁড়ে দেয় সময়-ওপারে

চারমাত্রা কস্‌মোলজি প্রতিপন্ন মূঢ় চেতনায়
বিস্ফোটের মত জেগে থাকে।

কবিতা লিখি না

[কালীকৃষ্ণ গুহ-কে]

কবিতা জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাই কবিতা-লেখার চেষ্টাই করি না
প্রসবের রক্ত খরা মৃত্যুর তাতা-থৈথৈ বৃষ্টি
এই নিয়ে কথকথা করি
স্বপ্নের ও কাজের পার্থক্য জানি না
যেমন জানি না নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমজাদের পার্থক্য
তাই থাকা ও না-থাকা নিয়ে রাগারাগি করি কান্নাকাটি করি
এবং রাগারাগি কান্নাকাটি করলে কবিতা হয় না
কবিতা-লেখার চেষ্টাই করি না
সুন্দরী রমণী ভাত রাস্তার গর্ত পশুর ও শিশুর হাসি
এই নিয়ে গ্রাম্য যাত্রা করি
গ্রামের লোকেরাও আজকাল এইসব দেখে বিরক্ত হয় উঠে যায়
ভাগ্যিস কয়েকজন ভিখিরি ও ভবঘুরে ছিলো।

এই দেশ

হারানের কথা যদি বলো তবে কি উত্তর হবে, জানি।
হারান পায় নি ভাত অথবা বিচার।
ফলে, সে, পুরাণ-কল্পে, ভূত হয়ে আছে।

এই দেশ— এইসব বটগাছ বাবলা-শিমুলগাছ— হারানের,
হারানের ভাই-বন্ধুদের।

এখনো জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখি :
আকাশে— অনেক দূরে— লণ্ঠন জ্বলছে ; তার পাশে ব'সে আছে
মাথা-নিচু প্রেতাত্মা হারান।

নাক্ষত্রিক

বারবার কী চেয়েছি, যদি প্রশ্ন করো, বলে দিতে পারি
ঈশ্বরের ধ্বংসস্তূপ।
অথবা বলতে পারি : কার্তিকের হিম আর চর্যাপদ, আদিম বাগান।

বিলম্বিতে একে তুমি কখনো নেবে না।

আমি দ্রুততার দিকে যেতে গিয়ে অকস্মাৎ, অন্ধতাবশত, এক নাক্ষত্রিক
চণ্ডালের দিকে চলে যাবো।

চারজন বধির যুবক

বোবা যুবকের ক্রোধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তিনজন বধির যুবক।
সভ্যতা দেখেছে তারা চারজন, অসহায়ভাবে, তবু
জন্মসূত্রে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়ে আছে।
সভ্যতার অর্থ তারা প্রধানত বিজ্ঞাপন জানে, পাশে
কালজয়ী নর্দমার স্রোত। ধর্মতলা।

'আরো মদ চাই' এই বোধে আলোড়িত
প্রথম যুবক।
দ্বিতীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থজনও আলোড়িত, কিন্তু অসহায়।
তর্ক চলে।
যানবাহনের গতি অস্পষ্ট, বিরল।
মধ্যরাত্রির দিকে উন্মাদ নিশ্চল তর্ক প্রসারিত হয়।

ওই চারজন বধির যুবক জানে : সভ্যতার শেষে আছে আরো আরো
মদ, আর
কাতরতা, অবিরল অঙ্গ-সঞ্চালন।

আসন্ন বসন্তকাল ছেয়েছে তাদের।

জনৈক বাণিজ্য-পুরুষের প্রতি

তোমার জীবন দেখি ভ'রে আছে সামগ্রিকতায়।
নিমগ্ন যুবতী মেয়ে ফণার মতন চুল
তুলেছে অনেক ঊর্ধ্বে—
তার চাই রূপ আর অবারিত দিগন্ত-সন্ধান।
বিগত সাম্রাজ্ঞী স্ত্রী, স্মৃতিভারাতুর, ভাবেন : গোপনে ক্ষমার যোগ্য সেই
ভূতগ্রস্ত নিঃসঙ্গ কিশোর আজ
কীভাবে বসন্তকাল অতিক্রম করে তবে এখানে এসেছে!

তুমি নিজে গর্বিত ও ভীত—
দেখেছো অজস্র নারী কীভাবে মিলিয়ে গেছে সময়ের স্থির গর্ভে
সম্পদে ও অবচেতনায়।

ভীত; ফলে, একা।
কোলাহল থেকে তুমি মুখ তুলে দেখেছো উদ্ভিদ।
তারপর উজ্জ্বল গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের ক'রে
চালিয়ে গিয়েছো আনোয়ার শাহ রোড পার হয়ে
অতলান্ত রাত্রি আর নক্ষত্রের দিকে।

উত্তর

তোমার ঘুমের দিকে আমি যেতে চাই নি কখনো।
ঘুম এলো, আর সেই অবলুপ্ত নিসর্গ-চেতনা
চারপাশ থেকে ঘিরে এলো।

মধ্যরাত্রি; বিকেলের কাক-ডাকা এখনো রয়েছে?
নেই।
উন্মাদ এঁকেছে যতো দৃশ্যাবলি—শরতে-হেমন্তে-শীতে—দীর্ঘ যুগ ব্যেপে
তারো কিছু নেই।

তবে কী রয়েছে? কিছু নেই?

সে-উত্তর যে জেনেছে সে-ও মৃত, চার্চের পিছনে তার কবর রয়েছে।

অতি-গঠনের দিকে

যদি ভালো থাকি তবে লিখি এইসব নগ্ন ও নিথর লেখা।
কারা ম্লান ক'রে এলো, দেখি, অন্ধকারে—
আরো দেখি নির্জন কবিতা-পাঠ—শিকড়ে জড়িয়ে-থাকা
নিঃসঙ্গ কবির।
নগ্ন নয় এইসবকিছু?

অতি-গঠনের দিকে আমরা রয়েছি জেগে, অভিভূত; আর এই
বুর্জোয়া সভ্যতা।

সম্পর্ক

তুমি ক্ষমা করো নি আমাকে, তবু
এখন আমার কাজ সন্তর্পণে সবটা মিলিয়ে দেখা, যদি তা সম্ভব।

বাস্তবতা মেনে নিতে হবে, এ ছিলো প্রধান শর্ত।

কিন্তু যা প্রধান স্বপ্ন যা নেমেছে
ভয় থেকে আকাশ-নক্ষত্রলোক থেকে জঙ্ঘা থেকে
কার্পেটে, মাটিতে—
তাকে তুমি গ্রহণ করো নি।

আমরা তবু পাশাপাশি এগিয়ে চলেছি— হয়তো এক
ভূতের ভয়ের দিকে শুধু !

দেবারতি মিত্র

স্বর্ণকৌশিক

মেঘ রাগে হুড়মুড় ঝড়বৃষ্টি
যেন টেলিফোন নিজে নিজে কথা বলে।
উচ্চকোটি ফাল্গুনের লাল ছুঁচ
গা থেকে উপড়ে যায় স্রোতে,
দোফাটা ঘটিতে পোঁতা চারাগাছ
একঠায় ভেজে,
উদোম পাগল ঠাণ্ডা, চান করে বাঁচে।

হিজিবিজি চিড় ধরা কাঁচ
ফেটে চুরমার লণ্ডভণ্ড
লালচে আগুনভরা গোলা,
ছাতের দড়িতে মেলা কাপড়ের সাদা
রোদে জীর্ণ,
কাকের হাঁ বোজে না কখনো
যখনই দীপকে গান হয়।

এ দুঃখ বলবার নয়
আমি যদি শব্দ করতে চেষ্টা করি
এ, আ, ই, উ—

ন মাসের বাচ্চা মেয়ের মতো
বাগ্‌যন্ত্র উলটো দিকে ঘুরে থাকে,
থেমে যায় বাতাসের নাড়ি,
ফুলের আলজিভ থেকে
ভারী মৌমাছির মত গড়াই না সুরে।

তুমি স্বর্ণকৌশিক, হয়তো মর্মর
(মানে ধ্বনি), অথবা পাষাণ,
বলতে পারো গান করে কি-বা হবে ?
জঙ্গলে আগুনলাগা হরিণের
পাতা মাড়াবার শব্দে
ভেঙেছে কি বধিরের বাসা ?
বনের গোড়ালি থেকে আরো নিচে
সূর্যচক্র গড়াতে গড়াতে
নেমে যায় চুপিসাড়ে,
ছায়াকে ভর্ৎসনা করে গাছেদের শ্বাস,
অন্ধকারে কেঁপে ওঠে অ আ।

ভাতের সুগন্ধ চাওয়া কুয়াশায়
শুধু নিছকই খিদেতেষ্টা,
ফুটপাতের গন্নাকাটা মেয়েটার অবুঝ কঁকানি
ধরা থাকে আকাশে কি,
ধরা থাকে অক্ষরে কি ?
শোনো, স্বর্ণকৌশিক, তুমি প্রাণ,
না তুমিই ধ্বনি ?

জ্ঞানপাপ ও জ্যোৎস্না

আমার বেচালগুলো শুধরে দেবার জন্যে
এত আয়োজন ?
সুদর্শনের মতো বম্বে মেলের চাকা

ছুটে এসে ঘ্যাঁচ করে
কাঁধ বরাবর দুই হাত কেটে দিল।
তলিয়ে ছিলাম ঘুমে জলের কিনারে—
শিরাছেঁড়া গাছ যেন ডুবতে ডুবতে
তখনও আঙুল নেড়ে বলতে চায়—
সন্দেহ কি পাপ ছিল, তাই এত বিষ।
ভাঙা দেহ টেনে হিঁচড়ে
জলে নামতে না নামতেই
যত মাছ সব মরে ভেসে ওঠে,
আমার প্রকাশ্য ক্লেদে জলের তলার
বনকে বনও সাবাড়।
আকাশ অনবরত ধাক্কা খাচ্ছে
কানহীন স্রোতে।
সমুদ্রের নিচে চাঁদ বদ্ধ পাগলের ঘিলু
তলতলে তেতো,
গোড়াসুদ্ধু অতটা না ঝাঁকালেও
এই জ্যোৎস্না এমনিতেই মাথা ফেঁড়ে দিত।

সিঁদুর রঙের চোখ মহিষের,
কালের বাহন নয়, সে নেহাত পশু,
এ শিংয়ে ও শিংয়ে লুফে আমাকে ঝাঁকানি দেয়
যেন উদুখলে ধান থেকে তুষ,
জীবনের গা থেকে আলাদা আজ আমি।

জলাই জীবন।
তার বুকে বিকলাঙ্গ একটিমাত্র জ্যান্ত মাছ
আমার জিভের মতো নড়ে উঠে বলে—
এই পাপ জ্ঞানপাপ, এ জন্মে ধোবে না।

আয়ত সুখ

এইমাত্র জবাই হয়েছে
এমন মুরগির বুক থরথর খাতা—
ওঙ্কার লিখি না তাতে,
বহুভুজ একটি ক্ষেত্র আঁকতে চেষ্টা করি—
কত দিক থাকে তার, লক্ষ লক্ষ ?
অথবা আদৌ কোনও দিকই থাকে না,
যাক, আমি আপাতত অস্থির আয়তক্ষেত্র আঁকি।

এক বাহু নিজে নিজে নেমে আসে—
আলপসের কুয়াশা থেকে সাদা ফুল
এমন ছড়ায়,
সবকিছু ঢেকে ফেলে এত চিহ্নহীন—
খুঁজে খুঁজে তোমাকে পাব না।

আরেকটি হাত তার
জীবজন্তু গাছপালা জ্বলে খাক হয়ে যাওয়া জঙ্গলের
পোড়া গন্ধ,
সংকারবিহীন লম্বা ছায়া—
সেদিকে তাকাবে নাকি কেউ ?

অন্য বাহু
ঋষির নীলাভ গাই দূর বা বধূসরা নদীস্রোতে
বৃষ্টিঝরা মেঘ হয়ে মিশে গেছে—
তার খোঁজ নেই।

চতুর্থ হাতটি
বিশ আঙুল ও চোখ দিয়ে

এমন কি মাথা ঠেলে ঠেলে
আমি ধরতে চেষ্টা পাই—
কিছুতে আসে না।
তখন প্রেরিত ঠোঁটে এঁকে এঁকে
ক্ষেত্র শেষ করি।

গায়ে শান্তি লাগে

অকৃতী পাখির বুকে ছুটন্ত গুলির দাগ
যতটুকু লাল
তা-ও তো নিজস্ব বলে সরিয়ে রাখি নি।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি সমস্ত দিয়েছি যে রকম
পাতার অসংখ্য চোখ দিয়ে গাছ
সূর্য শোষে, স্বার্থপর নিচু।

কিছু তো সবুজ হবে!
ডালে ডালে তিনমুখী ঝারি কই,
যাতে করে আলো ঢালতে পারি?
ফুল সে পরের কথা
কালো মানুষের হাসি যেন ব্যথাহীন ঢল,
হাঁড়ির ঢাকনার নিচে জল
প্রায়সিদ্ধ ভাতকে উতলা করে তোলে।

কি করে বোঝাব আমি
যা বলেছি যা শুনেছি ভুল।
আমার দু কানে দুল দেখেছিল,
শব্দ যে নিজেই শোভা তা কেউ ভাবে নি,
ঠোঁটে জিভে ধাক্কা লেগে
যে ঢেউ ওঠে তা মিথ্যে,
বাকের সমুদ্র আছে আলাদা কোথাও।

আমাকে খাদের ঢালে নিয়ে যাও—
তারা দেখতে দেখতে যদি পড়ে যাই
ভেঙেছুরে দিগন্তরেখার মতো উপচে উঠব।
একটিমাত্র নীলে তুমি
তুমিই সম্পূর্ণ হও।
কোনো রঙ গায়ে লেগে থাকে না জেনেও
মানুষ যেমন ধর্মান্তরিত হয়,
শান্তি পায় আকাশের নিচে।

মানিক চক্রবর্তী

ঘাসের ডগা বেড়ে গেছে

একটা রেললাইনের ধারে
কি একটা স্টেশনের কাছে থাকার অনেক সুবিধে—
এমন অনেক জিনিস,
খুঁটিনাটি অনেক কিছুই
দেখা যায়,
যার সঙ্গে আমাদের সভ্যতার মিল আছে—
দোলের অনেক পরেও আবছা-আবছা রঙ
দেখতে পাওয়া যাবে প্ল্যাটফর্মের একেবারে ধারে,
কোনো না কোনো জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবেই!
মানুষের পায়ে-পায়ে ফিকে হয়ে গেছে হয়তো,
ধূসর হয়ে গেছে,
কিন্তু দেখলে এখনো তার এতদূর দেখা যায়,
একেবারে অন্তঃস্থল অবধি—
সচেতন মানুষকে ঠিক সেটা নাড়া দেবেই।
মানুষকে চমকে উঠতে হবে!
অবশ্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম আমাদের জীবন নয়—
তবু একদিন কতগুলো চ্যাংড়া ছেলে

যখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল,
'ঐ দ্যাখ, দুটো রেলের মাঝখানে, স্লিপারের ফাঁকে-ফাঁকে
কেমন জল জমেছে !
সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে কেমন ;
এখন সবে চৈত্রমাস,
এর মধ্যেই এদিকে-ওদিকে,
ঘাসের ডগা কেমন বেড়ে গেছে,
দেখেছিস ?'

দুলুভাই

কিছু কিছু জিনিসের ওপর আমাদের লক্ষ্য পড়ে ;
কিন্তু লক্ষ্য পড়ে না !
যেমন লক্ষ্মীর ছবিতে লক্ষ্মীর পায়ের নিচে পেঁচা
যেমন ঘুলঘুলির ভেতর থেকে ভেসে আসা চড়ুই পাখিদের
অবিশ্রান্ত কিচির-মিচির,
যেমন নিজস্ব সন্তানের হাতের নোখ, পায়ের নোখ,
যেমন হালে গজিয়ে ওঠা বাংলা একাদেমির মত বীভৎস সব ব্যাপার—
এরকম বলতে-বলতে তালিকা আরো দীর্ঘ হয়ে যাবে।
তার চে বরং রোববার বিকেলে সুভাষগ্রাম স্টেশনের দুলুভাইকে দেখি—
একদল ছেলে ফুটবল ম্যাচ খেলতে বারুইপুর যাবে—
তার সঙ্গে বেঁটে আর এলোমেলো চোখের দুলুভাই—
আলাদা দাঁড়িয়ে আছে ও, গোঁফের রেখা স্পষ্ট,
কিন্তু এমন একটা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে,
যেন অনেকখানি মাটি তখন তার পায়ের তলায়
নিয়ে আসতে পেরেছে সে,
কিন্তু আমরা তা জানি !
দুলুভাই সেরকমই—যখন কিছু হাল্কা জিনিসের ওপর আমাদের লক্ষ্য পড়ে,
অথচ লক্ষ্য পড়ে না !
আসলে দুলুভাই একটা চামচ। কখনো ডাক্তার দত্তের,
কখনো সুভাষগ্রামের সবচেয়ে ফর্সা বারবণিতা

সোহিনী পালের চামচ।
অথচ ছুটির বিকেলের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে দুলুভাই,
এক দঙ্গল ফুটবল-ছেলের সঙ্গে—
যেন টিমের ম্যানেজার সে !
আর পা ছড়িয়ে, ঘাড়টা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে
দুলুভাই চারপাশটা এমন দেখে নিচ্ছে,
এখন আমাদের লক্ষ্য না করে উপায় নেই !
দুলুভাইর যা বয়স (ওর বয়স কেউ জানে না),
দুলুভাইর যেটুকু সংসার (ওর সংসার বলে কিছু আছে বলে
আমি জানি না),
দুলুভাইর যা অস্তিত্ব (দুলুভাইর অস্তিত্ব বলে কিছু নেই),
একমাত্র, এই গ্রীষ্মের রোববার বিকেল চারটের সময়
স্পষ্ট যেন বোঝা গেল !
এখন দুলুভাইকে দেখতেই থাকি,
দুলুভাইকে দেখতে থাকি !
কোনোদিন এভাবে তো আর দেখতে পাবো না !

ধীরে-ধীরে হাঁটো

ট্রেন থামল,
এবার নামো,
নেমে যাও
শেষ স্টেশনে।
রোদ পড়েছে প্ল্যাটফর্মে,
ছাউনি বরাবর একটা
কালো-জমাট ছায়ার রেখা ;
তুমি না-হয় রোদ্দুরে দিয়েই হাঁটবে—
দাঁড়িয়ে-থাকা ট্রেনটার গা ঘেঁষে-ঘেঁষে—
কি সুন্দর দেখাচ্ছে ট্রেনটাকে,
এখন দেখলে মনেই হয় না
এর ভিতরে এত কিছু ছিল !

ধরো প্রায় একঘণ্টা, কি একঘণ্টা দশ মিনিট
প্রথম এক মেডিকাল রিপ্রেজেনটিটিভের বকবকানি,
পরে ঠামুয়া স্টেশন থেকে উঠল একগাদা কলেজের ছাত্র—
মনে হয় ওরা সবাই ফকিরচাঁদে পড়ে—
এতো হৈচৈ, ঠাট্টা-ইয়ার্কি, এতরকম আলোচনা,
এতো মেয়েচর্চা—
শেষ পর্যন্ত এসব ছেড়ে হাঁটতে থাকো বিরাট গঙ্গার ধার দিয়ে ;
তুমি রিক্সায় উঠবে ?
না, থাক্ ।
এখান থেকে হেঁটে পাঁচ মিনিট মাত্র—
ধীরে-ধীরে হাঁটো ।

কবিতা লেখার ভবিষ্যৎ (১)

আলোক সরকার

একটি কবিতার ভবিষ্যৎ আর একটি কবিতা— এ-ছাড়া কবিতা রচনার আর কোনো ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতে পারি না । সব কবিতাই হয়তো এইরকম ভবিষ্যৎ-সম্ভব নয়, অনেক কবিতাই হয়তো হারিয়ে যায়, কলরোল-হীন স্পর্শহীন ভেসে যায়, তবু এটাও সত্য 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা', সেই ব্যর্থ অবজ্ঞাত কবিতাটি যার স্মৃতি তার স্রষ্টার কাছেও আজ অপরিসীম ম্লান, 'যে ফুল না-ফুটিতেই' ঝরে গেছে তার অন্ধকার নিস্তব্ধ ভূমিকা কোথাও আজো হয়তো স্পন্দমান । এটা তো বুঝতেই পারি কবিতা রচনার ইতিহাস একটা ধারাবাহিকতার ইতিহাস । এই ধারাবাহিকতার একটা দিক ব্যক্তিগত, অন্যটা ঐতিহাসিক । একজন কবির কবিতা রচনার ইতিহাস একদিকে তার হয়ে-ওঠার ইতিহাস, সব কবিই ক্রমজায়মান, তার প্রথম কবিতা থেকে শেষ কবিতা একটা ক্রমবিকশনের ইতিহাস, সেখানে তার প্রতিটি কবিতাই দ্বিতীয় কবিতার পটভূমি, তার সব কবিতাই তার রচিত পূর্ববর্তী কবিতা, কবিতাবলীর অলক্ষ্য কখনো বা প্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎ । অন্যদিকে যে কোনো কবিই ঐতিহ্যের পটভূমিতে কবি— আজকের দিনে সেই ঐতিহ্য পটভূমি স্বদেশ ছাড়িয়ে, কোনো কোনো কবির বেলায়, যে অনেক ব্যাপ্ত, সেটাও আমাদের অভিজ্ঞতা বলবে । যে কোনো কবিতাই দেশ-কাল নির্বিশেষে তার পূর্ববর্তী কবিতা কবিতাবলীর ভবিষ্যৎ, অন্তত অতীতের একটা সামগ্রিকতার ফসল তাতে আর সন্দেহ কি !

আজি হতে শত বর্ষ পরের একটা প্রশ্ন বোধহয় সব কবির মনেই বেজে ওঠে । আজ থেকে একশো বছর পরেও আমার কবিতা কেউ পড়ছে, এটা ভাবার মধ্যে একটা নিবিড়তা আছে নিশ্চয় । বাস্তবত, রচনার একশো বছর পরেও কোনো কোনো কবিতা পঠিত হয়, তার অনেক অনেক বেশি সময়ের ধুলোও অনেক কবিতাকে মলিন করতে পারে না । কিন্তু এটাও তো মাননীয় বাস্তব, কত কত কবিতা জন্মমুহূর্তেই হারিয়ে যায়, কত কত কবিতা সামান্য সময়ের ভারও সহ্য করতে পারে না, ছাপার অক্ষরে তাদের অস্তিত্ব থাকলেও কারো হৃদয়-তরঙ্গের সঙ্গে তা আর সমতানে বেজে উঠবে না । কত কত কবিতা আছে ছাপার অক্ষরেও যাদের আর খুঁজে

পাওয়া যাবে না। তবু কোনো কোনো স্মৃতি, কোনো হৃদয়তায় একটা কবিতার দু-একটা পঙ্‌ক্তি কখনো কখনো থেকে যায়— সেটাও কি কম বাঁচা! আমার ব্যক্তিগত তহবিলে এইরকম কত পঙ্‌ক্তি আছে, তাদের রচয়িতার নাম অনেক ক্ষেত্রেই ভুলে গেছি, পুরো কবিতা মনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না, তবু আজো যখন বর্ষণ দিন ঘনিয়ে আসে, এপার ওপার জুড়ে আকাশে জল-ভরা কালো মেঘের উদাস ভেসে-যাওয়া, তখন মনে মনে বলি :

ওগো কালো মেঘ বাতাসের বেগে যেও না যেও না যেও না ভেসে
ভুবন ভুলান মূরতি তোমার আরতি তোমার সকল দেশে।.....
করুণ তোমার কালো আঁখি হতে দুটি ফোঁটা জল পড়িল ঝরে
ব্যথা পাও যদি তবে কেন যাও ?.....

কবিতাটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় আজ থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে, শৈশবের বিস্ময়ের জগতে, আজো ভাঙা ভাঙা এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আমার কাছে আবহমান বেদনার নিস্তব্ধতা।

একটা কবিতার এইরকমই তো ভবিষ্যৎ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অরুণকুমার সরকারের 'হলদে প্রজাপতি' নামের কবিতাটির কথা। 'হলদে প্রজাপতি' দুজন পাঠক পেয়েছিল, সেই দুজনেই আজ মৃত। তবু যতদিন তাঁরা বেঁচেছিলেন, বেঁচেছিল হলদে প্রজাপতি। 'হলদে প্রজাপতি' নামের কাব্যগ্রন্থের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষত এইটুকুই। তবু এটা কি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারব, বাংলা কবিতার প্রবাহের ভিতর হলদে প্রজাপতি তার গোপন লাজুক ভীরু কোনো পদধ্বনি একেবারেই রেখে যেতে পারেনি! অরুণকুমার সরকারের কবিতার ভিতরে হয়তো তার কোনো কাজ ছিল এবং অরুণকুমার তাঁর নিজের যুগে এবং পরবর্তী সময়েও কোনো কোনো কবির অনুরাগ অর্জন করতে পেরেছিলেন।

কবিতা লেখার ভবিষ্যৎ (২)

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সমর সেন বলতেন, কবিতা লিখে কিছু হয় না। নিজে তো লিখেছেন। আবার, লেখা ছেড়েও দিয়েছেন এক সময়। কী হওয়ার কথা মনে হয়েছিল তাঁর? বিপ্লব? না, তা তো হল না। শোষণ আর ত্রাণ, নিগ্রহ আর ভরতুকিতে অভ্যস্ত এদেশের অধিকাংশ শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ বড়রকমের কোনো পরিবর্তন চায় না এখন। স্থিতাবস্থা বজায় থাকুক। গণতন্ত্র আর বাক্‌স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকুক। সকলের জন্য কাজ নেই, কাজ করার ইচ্ছেও নেই সকলের। বিপ্লব মানে তো কেবল সুবিধেভোগী শ্রেণীর মানুষকে খতম করা নয়, দেশকে নতুন করে গড়ে তোলা। সে এক বিশাল যজ্ঞ, বিপুল পরিশ্রমসাধ্য সে-যজ্ঞ। তাতে বিশ্বাস অভ্যেসের ভিত নড়ে যাবে। প্রখর সাম্যবাদীও তাই ভাবছেন, এখন দাঁত-নখ গুটিয়ে রাখার সময়, চলছে চলুক, ধীরে ধীরে শ্রীবৃদ্ধি হোক।

কবিতা লিখে কী হয়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখে পড়ল খবরের কাগজের পাতায়, প্রথম পৃষ্ঠায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর লাইন— "অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" উটপাখি। এই তো! পঞ্চাশ বছর পরে উঠে এসেছে। গভীর উপলব্ধি থেকে উচ্চারিত এই প্রশ্ন শুধুমাত্র অনুপ্রাসের কারণে স্মরণীয় হয় নি তা হলে। যদিও দ্রুত বদলেছে পারিপার্শ্বিকের পট। প্রলয়-এর ধারণা আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়েছে এতদিন পর।

খবরটি পড়ে হতাশ হতে হল। পঞ্চায়েতে অপচয়ের কথা বলা হয়েছে তাতে। গ্রামাঞ্চলে একশ্রেণীর মানুষ নাকি ফুলে-ফেঁপে উঠছে, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো না থাকায়, উন্নয়নের কাজ এগোচ্ছে না। রাজ্য সরকার যেন চোখ বন্ধ করে না থাকেন, জনৈক বিধায়ক এই কথা বলতে চান। তা হলে, উদ্ধৃতিটা কী ভাবে এল? ওই সাংবাদিক—যিনি খবরটি সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করেছেন, বা তাঁর চীফ-সাব, ওটি তাঁর অলংকরণ। তিনি একজন কবিতা-পড়া মানুষ।

কবিতা লিখে কী হয়? কোটেশনের ভাঁড়ার তৈরী হয়। পরবর্তীকালে যাতে সাংবাদিক, বিধায়ক, দেশনেতা, অধ্যাপক, সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী,

যে-যার সুবিধেমতো অংশবিশেষ তুলে নিয়ে নিজের কাজে লাগাতে পারে। প্রাসঙ্গিকতা থাক বা না থাক। ইংরেজীতে শেকস্‌পীয়র থেকে এলিয়ট, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সুকান্ত— সকলেই এই ছিনতাই-এর শিকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার মানুষ জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা থেকে পংক্তি তুলে তুলে স্লোগান তৈরী করেছিলেন, শুনতে পাই। "আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে— এই বাংলায় / হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ; /... হয়তো বা হাঁস হব— কিশোরীর— ঘুঙুর রহিবে লাল পায়।" কবি তো মন বিকিয়ে দিয়েছিলেন "বাঙালী নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল, / হাতে তার শাড়িটির কস্তাপাড় ;—ডাঁশা আম কামরাঙা ফুল।" মুক্তিযুদ্ধজয়ের কুড়ি বছর পূর্ণ হতে চলল, এই নারী কেমন আছে, আমি জানতে চাই।

আমি পাঠ্যপুস্তকের কথা তুলব না। সেগুলি এক-একটি লাশকাটা ঘর। যে-সব কবিতা পঠিত হয়ে-হয়ে মরে গেছে, পচে গেছে, নতুন প্রজন্মের কাছে যে-সব কবিতার আর কোনো অর্থ অবশিষ্ট নেই, সেই সব লাশ স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে গিয়ে জমা হয়। সরলপ্রাণ কিশোর-কিশোরীরা এক হাতে নাক টিপে অন্য হাত দিয়ে সেগুলি কাটা-ছেঁড়া করে, ব্যাখ্যা লেখে। বিরক্ত হয়, বিষণ্ণ হয়, তারপর এক সময় কবিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে চিরদিনের মতো চলে যায়।

কবিতা লিখে টাকা হয় না, প্রতিপত্তি হয় না। সে তো আরো অনেক কাজ করেও হয় না। যেমন, দাতব্য চিকিৎসা, নৈশ বিদ্যাবিতরণ, কি বন্যাত্রাণ। কিন্তু এই সব কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি এক ধরনের তৃপ্তি পায়। সে সমাজের কল্যাণ করছে। মানুষ কৃতজ্ঞ হচ্ছে তার শুশ্রূষায়। সে একজন দরকারি মানুষ। তাকে না হলে চলবে না। এ কি কম কথা! আর, যে লোকটি কবিতা লেখে, আর কিছুই করতে পারে না, সে হল সমাজের গলগ্রহ। গল্প-উপন্যাস হলে না হয় কথা ছিল। পড়ে খানিক সময় কাটতো। এ এমন এক জিনিস যার অর্থ উদ্ধার করতেই দিন ফুরিয়ে যায়। এর ভাষা এমন প্যাঁচানো, বক্তব্য এমন লুকোনো—যদি কোনো বক্তব্য থেকে থাকে— যে, পাঠককে টানা তো দূরের কথা, ঠেলে সরিয়ে দেয়। এই মোষ তাড়ানোর কাজে কোনো গৌরব নেই।

আবার জীবনানন্দকেই স্মরণ করি :

"একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে— একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চলে গেল যুবকের দল
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা, – এই সব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তলমূর্তি : তবু আহা ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকদল
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।"

রবীন্দ্রনাথের ১৪০০ সাল কবিতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি কামনা করতেন শতবর্ষ পরেও তাঁর কবিতা কেউ পড়বে। বাতায়নে বসা সেই মানুষটি— হয়তো কোনো সুন্দরীর মুখই তিনি কল্পনা করে থাকবেন— পরম আগ্রহে কবির অনুরাগ ও পুলকের স্পর্শ উপভোগ করবে। ১৪০০ সাল আসতে দেরি নেই এবং কবির প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে বলে মনে হয় না। তবে, সুন্দর মুখের মেয়েরা যে খুব একটা রসবোধ-সম্পন্ন হয় না, এ-তথ্য আমরা পরে জেনেছি। তা সত্ত্বেও নির্বোধ কবির দল ওই সব সোনার পিত্তলমূর্তির উদ্দেশেই তাদের বেদনা ও অভিমানের ফুলগুলি নিবেদন করে। কবিকে অন্তরে ধারণ করে রাখে দুঃখী মানুষের দল। স্পর্শকাতর ওই সব পাঠকের কাছে পৌঁছনো যাবে আশা করে আমাদের যাবতীয় লেখালেখি। ঐশ্বর্য ঢেলে যাওয়া।

কেন লিখি? কারণ, না লিখে পারি না। এই অসহায় অবস্থা আমার কাছে হাস্যকর। নিশ্চয় আমি সচেতনভাবে কিছু করতে চাই। আমার চিন্তাভাবনা, আমার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, আমার ক্রোধ আর ভালবাসার কথা, আমার আনন্দ আর অভিমান, জানিয়ে রাখতে চাই। আমার সারা জীবনে লেখা সমূহ কবিতাবলী আসলে একটা দলিল। এই দলিলে আমার একটা জীবন, সমমনস্ক একটি যুগের জীবন, কেমন কাটলো, তা যেমন বলা থাকছে, সেই সঙ্গে ধরা থাকছে আমার পরে যারা পৃথিবীতে এলো তাদের জন্যও কিছু বার্তা। কিছু অন্তরঙ্গ কথাবার্তা। আমার চিন্তাভাবনাগুলি যদি জীবন্ত ভাষা ও অমোঘ শব্দের আশ্রয় পেয়ে থাকে, আমার কল্পনা ও সৃজনশক্তি যদি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার যোগ্যতা পেয়ে থাকে, তবে আমি ব্যর্থ নই।

খুব বেশি লোক কবিতা পড়ে না। না পড়ুক। যারা অসন্তুষ্ট

অথচ সংবেদনশীল মনের অধিকারী, তারাই পৃথিবীতে স্থায়ী কাজ করে যাবার ক্ষমতা রাখে। সংখ্যায় যত অল্পই হোক না, তারাই কবির গ্রাহক ও ভোক্তা। বাকি যারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের কথা ভেবে, উপভোগকে লক্ষ্য-বস্তু মনে করে, অসাড় আহ্লাদে জীবন কাটিয়ে যেতে চায়, তারা দূরে থাক। জানি, সেই সব ব্যস্ত মানুষের খোসা পড়ে থাকবে শুধু। আমার লেখালেখি তাদের কোনো কাজে লাগলো না বলে আমার দুঃখ নেই।

এই স্পর্ধার মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে কবিতা লিখে কী হয়, এই প্রশ্নের উত্তর।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

চলচ্চিত্র

পৃথিবীর গভীর নিঃসঙ্গতার ভেতর থেকে
এক গোপন বাতাস জেগে উঠল মৃদু নিঃস্বনে
আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল তার বেগ
দুলতে লাগল ডালপালা নদী পাহাড়
তারা রাত্রির আলোড়ন থেকে বেরিয়ে এসে
এক কোমল আলোর রেখা
মারাত্মক তীরের মতো বিঁধল
স্বচ্ছ সময়ের বুকে
অমনই এক ফোঁটা চূর্ণী শূন্যের গা বেয়ে নেমে
মাটিতে পড়ে হলো এক অধরা রমণী
শুধুই সৌন্দর্যে ঢাকা তার সমস্ত শরীর
স্রোতের মতো বাঁশির সুরের মতো গতি তার
ভেসে যেতে যেতে যখন সে অনিমেষে দাঁড়াল
ফুটে উঠল এক আশ্চর্য তরুণী তরু
ডালে ডালে লাল হলুদ বেগুনি ফুলের মেলা জমতেই
শুরু হলো অজানা সব পাখির কাকলি
তারপরে রংবেরঙের ফুলের সংসার
এক ঝাঁক পাখি হয়ে উড়ে গেল
চিহ্নহীন

দীপেন রায়

ছায়াসমুদ্র

যে ঘুমিয়ে আছে আমি তাকেই পাহারা দিই, জেগে থাকি
মাথার পাশে, মাটিতে একা। গোপন মেরুন, জলপাই রঙের
অর্পিত বিশ্বাসের কাছে মেদুর, ছায়াসমুদ্রের মৌন :
নক্ষত্র মণ্ডলে নুয়ে দেখি দু-চোখের অপরূপ ঘুম।

হলকা রোদ, বাতাসের হালকা কাঁপায় চোখের পাতাও,
ঘরে বাইরে একা আমার সবুজ। মানুষের মৌনে গূঢ়
আলতো মেঘ শরতের কিংবা চৈত্রের কাপাস,
তাকেই পাহারা দিই যে আছে ঘুমের সমবেদনায়।

কবিরুল ইসলাম

যার জন্যে ইত্যাদি

যার জন্যে চুরি করি : যার জন্যে ক্ষেত খামার তছনছ বিরান
যেমন বা মাতাল ঝঞ্ঝা অঘ্রানের শস্যের শিকড়ে
শেষ মোচড় দিতে চেয়ে সাজানো সংসার নয়-ছয় করে :
ভূমির ভূমার শয্যা গ্রহণে বিবস্ত্র ধ্বস্ত কৌমার্য হরণে
আগামী প্রজন্ম যে বীজের বিজন জুড়ে মথিত উড়ালে....

হায়, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর ॥

অশোক দত্তচৌধুরী

শ্রোত্র

ভোর শেষ হলে সূর্যের চোখ থমকে দাঁড়াই
দাহ-তাপ নিয়ে শিমুলের ডাল, একলা বাড়ির
চড়ুই ডাকার আজ সেই মেয়ে আত্মস্বরূপ
শ্মশান পেরোনো— সারথি উবাচ স্বজ্ঞা কখন
আয়স বর্ণ ? খোলা জানলার তৃণ নিঃস্বন
বস্তু বিশ্ব— টালিগঞ্জের ধুলো-ভরা মাটি
ফাঁকা বাজারের এঁচোড় সজনে সকাল দশটা
অগ্রদানীর—যা কিছু দেখছি লতাজাল চোখে ?
আধার তবুও জল নিমপাতা, কুকুর ডাকলো
সাদা বাড়িটায় পর্দা দুলছে অশ্রুত জ্ঞান
দাঁড়িয়ে রয়েছি এগিয়ে চলেছে গাজনের মাস।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মৌহূর্তিক অনুভূতিমালা

সকালটা শুরুই হলো মেঘলা আকাশের নিচে
যেনোবা অপেক্ষমাণ বিষাদ
নাড়া খেলেই
অবেলার কান্নায় ভেঙে পড়বে
আর ও কাঁচ পোকাটার একটানা ভোঁ ভোঁ
আর ইটভাটার মজুরদের গুনগুনানি, কোথাও
ঘু ঘু চলেছে ডেকে, বড়ো শূন্যতা,
ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়

আর এই পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ন্যাড়া গাছটা
এবারও সারা গা'য়ে বর্ষা মেখে
হেসে উঠলো না ; অথচ
ওরই প্রতিবেশীদের গা'য়ে চড়েছে সবুজ পোশাক
চড়ুই খাচ্ছে ঠুকরে ওদের বীজফল
কাঠবিড়ালী উঠছে নামছে গা বেয়ে
জীবনের অস্খলিত বিকীরণ

ফণিমনসার কাঁটায়
বিঁধে আছে টুকরো রোদ। সময়টা
দিনের কোন্ বিশেষ যাম, জরুরী নয় তা
জানা ; এই মুহূর্তে
কোন আকাশ থেকে খ'সে পড়লো তারা
কোন প্রিয়জন সূক্ষ্মদেহে উড়ে চললো
নক্ষত্রলোকের দিকে, কে ভাসালো
নৌকো মাঝদরিয়া লক্ষ্য কোরে
কোন অন্ধ দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে
ঠুকরে খাচ্ছে পাকা ফল কোন পাখি, কেউ
জানি না ; অথচ

বেঁচে থাকার আবেশ নামছে চোখের
পাতায়, আর—
ঝমঝম নামলো বৃষ্টি
শীর্ণ কাকটা ভিজতে লাগলো তারের উপরে
খোলা জলের স্রোতে
ভেসে যাচ্ছে খরিশ সাপের খোলস
কোথাও
ব্যস্ততা নেই ; এই
শুরু এবং শেষ মিলেছে কোন মায়ালোকে, কোন্
ইতিনেতির পরপারে ?

অভী সেনগুপ্ত

মাঝে-মাঝে, সবসময়

মাঝে-মাঝে মনে হয় অনিচ্ছার পাশে দাঁড়াই, দাঁড়িয়ে
খোজা অনিচ্ছাকে শরীরের সমুদ্ররহস্য শেখাই
মাঝে-মাঝে মনে হয় ইতিহাসের কাছে বসি, ব'সে বলি
—আমার সম সময়কে মনে রেখো, না হলে আবার ভুল করবে
মাঝে-মাঝে মনে হয় ধর্মের কাছে চ'লে যাই, গিয়ে বলি
—রাজন, জীবনের সর্বত্র এতো পুজো পুজো গন্ধ যে
বাসি মড়াও হার মেনে যায়
মাঝে-মাঝে মনে হয় আকাশকে ডেকে বুঝিয়ে বলি
—এতো উল্কাপাত একজীবন ঘটাচ্ছো, এবার মাটি থেকে
বীজ টেনে নিয়ে ফুল ফোটাও
ভরা যৌবনে নিজেকে সাজাও আরও কিছু অন্য রঙে

সবসময় মনে হয়—ভুল করি বেশ করি, নিজেকে
তছনছ করেও যদি তোমাদের খুশি না করতে পারি
সে আমার দোষ নয়, সে আমার সরলতার অহঙ্কার।

আমি যা বুঝি না

মন কতখানি ভাঙা
আমি বুঝি—
হাতের নখ কতখানি ভাঙা
আমি তাও বুঝি
পায়ের গোড়ালি কতটা ভাঙা
সে কথাও বুঝি
চাঁদের কণা কতটা ভাঙা
আমি বুঝি না
জীবনানন্দ বুঝতেন

যা আমরা জানি

আমাদের দুরন্ত মেপে ঢোল বাজে
ঢোল বাজে পাহাড়ের চূড়ায়
তাই বলে, নদী-খাদে নয়
নজরুল ইসলামেও নয়
ঢোল বাজে
ঢোল বাজে আমাদেরই অনন্ত রোমকূপে
ওকি মিহি অপেক্ষমাণ গান শোনাও তুমি
বালিকাময় চোখের পল্লবে
কেনই বা বালিকা তুমি আর কেনই বা বালিকা হয়েও যুবতী
কেনই বা আমার ডানা এমন ধূসরতর তোমার ডানার চেয়ে
পাহাড় বা নদী জানে না
নজরুল-সঙ্গীতও জানে না
জানে শুধু নিত্যবাহী, অনন্ত সঙ্গীতবাহী ঢোল
যা কেবল বাজে আমাদের রোমকূপে

দেওয়াল

এরকম খাঁচাও পৃথিবী থেকে উঠে গেছে !
এমনকি তোমাদের সব কথাবার্তাও
খুব পুরনো বলে মনে হয় আজকাল !

সূর্যাস্তের লাল রোদ জড়িয়ে ধরেছে
মাকড়সার পা !
বাগান ছেড়ে সে এসে আশ্রয়
নিয়েছে পশ্চিমের দেওয়ালে,
ঘরের বাকি তিনটে দেওয়াল ফাঁকা !

ওই তিনটে দেওয়ালে পড়েছে
সীমাহীন জনশূন্য সভ্যতার ছায়া ;
ভাবা যায় কি সাদা এই ছায়ার কথা ?
এরকম একটা খাঁচার কথা
যা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেলেও
জড়িয়ে ধরে আছে
জল-বাতাস সমেত সমস্ত মাটি ও আকাশ ?

শেষ নেই

ঝরাপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে
যেখানে পৌঁছই
সেখান থেকেই স্তব্ধতার শুরু,
যে স্তব্ধতা শাল-মহুয়া-পাহাড় ছুঁয়ে
অবশেষে আকাশে মিশেছে—
সীতারাম হেমব্রমের তীরধনুক এড়িয়ে যে স্তব্ধতায়
পাখি উড়ে যায়।

প্রবাহিত এই জীবনের কোন শেষ নেই।
আমাদের সব কোলাহল ও ক্লান্তি, আনন্দ ও বেদনা, স্মৃতি ও বিস্মৃতি
প্রতিদিনের আলোয় অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে
চিরন্তন স্তব্ধতার দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়—
শেষ নেই, প্রবাহিত এই জীবনের কোনো শেষ নেই।

ফিরে এসে

সমুদ্র বিশাল, পর্বত সুস্থির, জঙ্গল রহস্যময়।

কখনো সমুদ্রে যাই, কখনো পর্বতে,
কখনো জঙ্গলে—
বিস্তীর্ণ পটভূমিতে নিজেকে স্থাপন ক'রে
নিজেকেই বারবার জেনে নিতে চাই।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে এই সত্যটুকু বুঝে নিই:
বারান্দায় একফালি রোদ্দুর অথবা জ্যোৎস্নার দিকে
বহুক্ষণ মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকা যায়।

ধূলিধূলির ভিতরে ডিম পেড়ে পাখি উড়ে যায়
দূর নীলিমায়।

দর্শন

ভালুক এসেছে ছুটে জ্যোৎস্নায় মহুয়াতলায়
মোমবাতি ডিনারে আহা খানদানী সন্ধ্যার হোটেলে
অশ্বত্থ বৃক্ষটি ছিল তারো চেয়ে অধিক রসিক
পালামৌ স্টেশনে এসে এইসব মনে পড়ে যায়

জীবে ও নির্জীবে খুঁজি— খুঁজে যাই— আত্মপ্রতিকৃতি
সাহায্য করে না আর দর্শনের পুরোনো উদ্ধৃতি...

আসছি

জ্যোৎস্নার ভিতরে যাচ্ছ? যাও।
ফুলের বাগানে যাচ্ছ? যাও।
নদীটির কাছে যাচ্ছ? যাও।

তোমরা মিছিলে যাচ্ছ? যাও।
গ্রামে বন্যাত্রাণে যাচ্ছ? যাও।
শ্মশানে পোড়াতে যাচ্ছ? যাও।

তোমরা গুহায় যাচ্ছ? যাও।
ধ্যানমগ্ন হয়ে যাচ্ছ? যাও।
আলোঅন্ধকারে যাচ্ছ? যাও।

আমাকে ডাকছ বুঝি? আসছি।
আমাকে ডাকছ না বুঝি? আসছি।

স্বগতোক্তি

সারাদিন শুধু তোমার কথাই বলি।

হোঁচট-খাওয়া মন, গা-পুড়ে-যাওয়া মানুষ,
মাথা নিচু করে বসে-থাকা প্রেম
আকণ্ঠ তোমাকেই চায়!

রুগ্ণ মনের কাছে মুখ নিয়ে বলি,
আরোগ্যের ইচ্ছাতে আছো।
গা-পোড়া দুঃখের পাশ ঘেঁষে বলি,
নির্ভয় অন্তরে আছো।
হতাশ প্রেমের কাছে তোমার সাহস তুলে ধরি।

কত ভুল খেলায় পড়ে আছে উলঙ্গ উঠোন!
কত নষ্ট কথায় আটকে গেছে ঠোঁট!
কত মিথ্যে জাপটে আছে অবিশ্বাসী শরীর!
তুমি আজ মার্জনা করো!

তোমাকে জানে না মূর্খ, অজ্ঞান জীবন;
জানে না যে, সুন্দর প্রকৃতই তোমার স্বভাব।

প্রাক্তন স্বামীর ট্রাউজার

তালা খুলে সে যখন ঘরে ঢোকে দুপুর একটা
জেব্রার পেটের মতো থমথমে তিনতলা বাড়ি
দরজা বন্ধ করে একে একে সে খোলে পোশাক
মোজা থেকে বিনুনীর কাঁটা অব্দি নগ্ন সে তখন।

ওডিকোলনের গন্ধে ভরে ওঠে সম্পূর্ণ পৃথিবী
নগ্ন হয়ে ভাত খায়, একা, কেউ দেখবার নেই
বলবার নেই, চুলে আটকানো বিরাট চিরুনি
একটি মানুষ নগ্ন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

আয়নারও ইচ্ছে হয় কথা বলে, সেও তো মানুষ
বাক্সের ভেতর ফেলে রাখা পুরুষের ট্রাউজার
সমর্থ ঊরুর মতো সে উঠে দাঁড়াতে চায় আজ
তারপর, এই ফ্ল্যাটে, পরাক্রান্ত সে হেঁটে বেড়াবে।

প্রাক্তন স্বামীর ট্রাউজারটিকে দেখে সে কাঁদছে
কিন্তু আয়না বলে, 'নগ্ন হয়ে এভাবে কেঁদো না।'

একটি সনেট

আমার কি হবে আমি জানতে চাই না
হস্তরেখা, আমি তোকে ধরি পায়ুদ্বারে
জ্ঞানী না হয়েও জানি কে রাখে কে মারে
আমাকে মূর্খ করে রেখো না আয়না।

গরিব বাপের ছেলে ভাত জুটতো না
নিমোনিয়া সঙ্গে ছিল বছরে দুবার
সেখানে আর না, আর এক মুহূর্ত না

চলে আসি নৌকো নিয়ে নদীর এপার।

সাপলুডো বেয়ে উঠি নব্বই-এর ঘরে
বিরানব্বই নং পূর্ণ মিত্র প্লেসে
যেখানে ধর্মের কল বাতাসেই নড়ে।

কটা দিন দিশেহারা পেট ভরে খাবো
কার লেখা চিরস্থায়ী অন্নপূর্ণা মেসে ?
সূর্যরেখা, আমি তোর শেষ দেখে যাবো।

বাপী সমাদ্দার

হুড্রু বা নায়াগ্রা

পৃথিবীর হুড্রু বা নায়াগ্রা
দেখছি এস-১৪ বাসের হাতল ধরে।
একটু-পরে
সুন্দরবনে কুমীরের হাঁ দেখে সাটার টিপেছি ক্ষিপ্রতায়
ফেরিওয়ালার হাঁক শুনে আমি দুবরাজপুরে :
উদলা গায়ে ঘাম ঝরছে, কোঁচকানো ময়লা চেক লুঙ্গি,
আন্ডাবাচ্চা তিনগণ্ডা—
আকাদেমিতে শ্যামের জলরঙ ছবি দেখে
যুদ্ধ বা মড়ক তাও প্রত্যক্ষ করলাম এই চোখে (!)
এখন ফ্রিজের মধ্যে গুটিপোকা বসে আছি
খাট উড়ছে পতপত করে (জয় নবীন রাজার !)
চড়ুই ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল—
ঝলক ঝলক রক্ত খেয়েও বাঘিনী হরিণলোলুপ ;
এত কাছে লাল ডাকবাক্স নীল বালতি উপুড় করে দি
আশ্চর্য আগুন ফুলকি গুনে গুনে কে পাঠালো
কাচপোকা, ফিঙে, জোনাকি, হরিণ— কে তুমি ?
শব্দে, কলে, বর্ণে, সাধারণে, মাঠানে, আয়নায়
একটি পিনে গেঁথে সে ঘুরবেই লাটিম।

নিতাই জানা

বাংলা

রূপকথা নয়, মনে হ'তে পারে কোন রূপজল ;
ঝাপসা দুপাড় জুড়ে গড়ে তোলা এই দেশগাঁর
মেয়েটি ধূসর কথা বলে যার ; সেও এক মেয়ে :
আগুন নিভিয়ে ঘট ভেঙে আছে চিতার দু'ধারে।

পাতার সবুজ ছুঁয়ে বিকেলের মেঘ ছেঁড়া আলো
লুটিয়ে উজায় যত, কথামালা শেষ হয় তার :
একটি শিশুর মুখ ; চুপি চুপি ঝুঁকে পড়ে ভোর,
ঝ'রে পড়া পাতা চেপে পিঁপড়েরা ভাসে সারি বেয়ে।

আলো-আঁধারির পথ ধোঁয়া তোলা ধূপের মতন ;
আকাশ-নদীর মাঝে অগণন তারা আর কালো—
ছোটো ছোটো ঘর, দীপ জোনাকির, ছোটো ছোটো দোর ;
মেয়েটির দু'টি হাত উঁচু হ'য়ে খুলেছে শিকল :

এতপরে মনে হ'লো দুয়োরানী ; মলাট ধুলট
সরিয়ে উঠেছে এক শাদা শাড়ি, রাঙা লাল পাড়ে
ঘোমটার ঢেউ ঠেলে মুখ ভাসে শিষের মতন :
জল ঝরে, জল ভ'রে কাঁখে দোলে ঘট কি রাতুল।

ঘাট

কথা ফুরোয়, লতার মতো ধোঁয়া
পাকিয়ে ওঠে ; মেঘের 'পরে মেঘ
গুমরে ডাকে, বৃষ্টি ঝরো ঝরো
দিদির মুখ ঘুমের ছায়ে, রেশ
ফোঁপায় যত গাছের টং ফেঁসে
আলোয় ডুবে শাড়ির ভেসে যাওয়া...

শাড়ি কোথায়, মাজা কাঁসার জলে
খিড়কি ঘাট ডুবিয়ে আছে গলা ;
সোনার চিরু বুকের দোল ঘেঁসে
ছড়িয়ে পড়ে বৃত্ত থরো থরো :
পরীযানের সাতবেহারা সুরে
রক্ত ঝরে তামাটে কাঁধ ফেটে ।

রক্তে মাটি ভিজেও কালো কেশ
ওড়ায় যত বাজে কাঁসর মেঘ ;
ঝিলিক তুলে পেটের ভাই ঘুরে
তক্তিমালা পরায় কেঁদে কেটে :
ডুবলো ঘাট, ছল ছলাৎ জলে
দু'হাত তোলা : দু'গাছি রাঙা পলা ।

চাঁদ

বৃষ্টির শেষে শাদা মেঘ ভাসা নীল ঐ শূন্যতা
তুলে ধরে আছো কাজল সরায় ; টলমল বন্দনা
আর্ত আঁজলা তুলে ধ'রে কাঁপে, চারপাশ ঘিরে লতা
শুক ও শারির নীড় গেঁথে গেঁথে জল ফোঁটা আনমনা
ছড়িয়ে দিয়েছে পাতায় পাতায় : ভেসে ওঠা রাঙা মুখ—
এঁকে দিলো তারা, আকাশ-আকাশ ; এক কোণে ম্লান চাঁদ
তোমার চোখের জলে ভেজা কালো জড়িমালা প'রে তুক,
আমি কাশ তুলি : রক্ত বমন ঘিরে আছে উঁচু বাঁধ ।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

সত্য, আপনি যা জানেন আমি জানি

(কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর প্রতি)

আপনাকে যা বলেছি তা সত্য নয়
আপনি নিজে যা জেনেছেন তাও নয়
প্রকৃত সত্য আরো কঠিনতর অলঙ্ঘ্য ব্যাপার
তবু আমরা ভাবি ওকে ছুঁয়ে দেখেছি
আজ বা আগামীকাল আবার উঠে দাঁড়াব।
বস্তুত শিরদাঁড়া উঁচু করে আপনি আছেন
আমিও ভাবছি একটুও বাঁকাবো না সেটা
ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে হু হু বইছে বাতাস
শিরদাঁড়া কেঁপে উঠছে শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে
আদিম সত্য অনড় পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে।

সত্য, আপনি যা জানেন আমি যা জানি
তা ঠিক কিংবা ঠিক নয়
এক অলীক কুহক ক্রমশ জাহাজের মাস্তুলের মতোন
দূর দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে
ঢেউ উঠছে ঢেউ নামছে বালি ভেদ করে তৃণলতা
দোল খাচ্ছে
আপনাকে যা বলেছি ধ্রুব ভেবে
আপনি যা ভেবেছেন দীর্ঘতর সাধনায় সত্যসন্ধ হয়ে
হয়তো তার থেকেও ভিন্নতর কিছু
সূর্য ওঠা ও ডোবার মুহূর্তের মতোন অবর্ণনীয়
অনতিক্রমণীয় স্থির মুহূর্ত
অথবা তাও নয় আমাদের কোনদিন জানা হয় না ।

শান্ত রায়

রবিঠাকুরের দেশ

তবু পূর্বমেঘ জাগে তবু চন্দ্রোদয় আসে বাজে সকরুণ বেণু
স্বর্ণভ আশিনে
চলো সেতারের দেশে চলো যাই মুরলীর মৃদঙ্গের দেশে
কড়ির পাহাড় আর হাড়ের পাহাড় আর পাতালের অজগর, রাজকীয়
সুতাশঙ্খ সাপ—
ওরা থাকে থাক ; চলো সৌরভের, নক্ষত্রের, মানুষের—
রবিঠাকুরের নিজদেশে

গৌরীশঙ্কর দে

রাত বারোটার ট্রেন

রাত বারোটার ট্রেন তিনটেয় ছেড়ে গেলে
চিঠি লিখবো অমলেন্দুদাকে।

রাত বারোটার ট্রেন শৈল-শহরে এসে থামে।
চারদিকে ঈষৎ মৃদুল নীরবতা ;
নিঃশব্দ শুয়ে পড়ে হৃদগহ্বরে,
শিলনোড়া অব্দি ছড়িয়ে পড়ে ব্যথা।

অব্যক্ত রক্তের গন্ধে আর অপরিশ্রুত জ্যোৎস্নায়,
অগ্নির মতো আমি জীবন
শব্দটিকে ঘিরে বসে থাকি কোনো অপেক্ষায়...

রাত বারোটার ট্রেন তিনটেয় ছেড়ে গেলে,
ডেকে উঠলে প্রথম মোরগ, তুমি কার জন্য প্রতিদিন আসো,
দেখে ফেলবো তাকে। তারপর
চিঠি লিখবো অমলেন্দুদাকে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত

গিলোটিন (১)

গর্দানে নামে লোহার ধারালো পর্দা
দাঁতর ছিন্ন মাথাটি ভীষণ হাসছে
এলোমেলো চুল, বিরাট কপাট বক্ষ
ছিটকে পড়লো পর্দার দুই প্রান্তে

দূরে নির্জন একটি কক্ষে দাঁড়িয়ে
রোবসপিয়ের দেখছেন ভবিতব্য
সন্ত্রাসযুগ ! নাকি তা ফ্রান্সকে বাঁচাবে !
দূরে শোন নদী সূর্যাস্তের আয়না

শতাব্দীসেরা বলনৃত্যের আসরে
রূপান্তরিত আজকে প্যারিসনগরী
সারারাত ওরা রাস্তায় ঘুরে নাচবে
বাস্তিলমাঠে জাগে সঙ্গীত অপেরা

দুশো বছরের বুকের ওপরে শিশুরা
খেলছে রুপোর গিলোটিন নিয়ে দুহাতে।

গিলোটিন (২)

স্নানচৌবাচ্চার জলে গা ডুবিয়ে রূপমতী নারী
ভাবছিলেন পেছনে পড়ে থাকা অস্ট্রিয়ার কথা
সতের বছরে তাঁর গাল দুটি বসেরা গোলাপ
সারা প্যারি ম ম করে গন্ধে আর নাগরিকগণ
নিঃশ্বাসে সুঘ্রাণ টেনে নিতে নিতে গাল পাড়ে তাঁকে
চৌবাচ্চায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় খিস্তি ও খেউর
নারীর শরীরে বড় শিহরন, বাতাসের স্পর্শে
তাঁর শীৎকার হয়, পোশাক সমেত তাঁর স্নান

ডাচেস দ্য পোলিনাক শুধু তাঁর রহস্য জানেন
রাত্রে তাঁরা জড়াজড়ি ঘুমিয়ে থাকেন বিছানায়।

টামব্রিলে চলমান তাঁকে দেখা গেলো সাঁইত্রিশে—
বধ্যভূমির সামনে, উড়ে গেছে কোঁকড়ানো চুল
ভাঙা গাল, চোখে কালি, দর্শক বিমূঢ়, শুধু শিল্পী
নারী ও নিয়তি আঁকছেন— এ কোন আঁতোয়ানো!

শুকতারা রায়

তোপচাঁচীর আকাশী লেকে

তোপচাঁচীর আকাশী লেকে দুরন্ত ছায়া
কিছুতেই বাগ মানলো না। আমি কিন্তু নড়িনি।
শুধু অস্থির জলের বুকে চঞ্চল ছায়াকে বলেছি,
"শান্ত হও, হচ্ছেটা কী?"
"কেন শান্ত হবো? এমন স্থির সুন্দরকে
আমার ঢলানী নাচ দেখাবো না একটু?
কী ক্ষতি তাতে?"
"না তা নয়; ছাপোষারা অত নেচেকুঁদে কি করবে?"
"হোক্ না একটু নাচ। আমার সঙ্গে ধাপে ধাপে
স্বর্গে উঠবে।
তারপর আবার ওঠা আবার নামা।
এমনি কত বার। একটু জ্যান্ত ভাবে।
তুমি বরাবর ঠায় দাঁড়িয়েই আছো।
আমিই নেচে নেচে নেচে সারা।"

শিমুরালিতে পিকনিক

শিমুরালিতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম আমরা।
সবাই মত্ত রান্নাবান্না আর পানভোজনের ঝোঁকে।
নদী মাঠঘাট আর পানের বরজ পেরিয়ে
আমাকে কে যেন নতুন কিছুর খোঁজে
ছুটিয়ে নিচ্ছিলো।
আমাদের চড়ুইভাতির উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে দেখা গেল
খানিক দূরে অন্য একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী।
আরেক পিকনিকের দল? হ্যাঁ— পথের
শেষে দেখা মেলে। সেই চেনা শবমেধ
যজ্ঞের আগুন। ভাঙা কলসী। বিভূতিমাখা
বাতাস।
বাউল আকাশ পৃথিবী একতারাতে
আলগোছে এক সারিগান বেঁধেছে।
শ্মশানে একটিই চিতা। গনগনে দাহ।
ক'জন লোকের হাতে খোলকরতাল,
মুখে বোল—
"কোন নামে আজ পত্র লিখিরে—
আমার গ্রাম পোস্টঅফিস নেই জানা,
আমি বন্ধুরে হলাম অচেনা।"

মৌ দাশগুপ্ত

মথ

সিঁড়ির নিচের দরজাটা ফাঁক করতেই মার মুখে সাদাটে আলো, রেলিঙের
ওপাশ থেকে সে দেখতে লাগলো মার অদ্ভুত মোটা ঠোঁট
আর অবলুপ্ত বোকাটে চোয়ালের একপাশ তারপর সিঁড়ির নিচ
থেকে উঠে আসা ভ্যাপসা আলোয় সে নিজের হাতের আঙুল গুনতে
লাগলো পায়ের আঙুল গুনতে লাগলো দুকানে হাত
বোলালো আর অবাক হলো ওই মহিলার গর্ভে জন্মে কীভাবে
তার দশ দশ কুড়িটা আঙুল এপাশে ওপাশে দুটো কান
দরজার চিলতে দিয়ে মা ভয়ার্ত ঘোলাটে চোখে
বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বাঁ হাতটা অনবরত
উরুতে ঘসতে ঘসতে বলছে মীনা এলো না মীনা এলো না
সবে একটায় মীনা আসে না কিন্তু সে কিছু বললো না,
সে কিছু বলে না
আজ অনেকদিন হলো সে কিছু বলে না
এখন ঘনঘোর দুপুরে মা দরজার হুড়কো লাগিয়ে আপন মনে হাসলো
একবার সে ভাবলো হাসলে মায়ের চোয়াল আরো হারিয়ে যায়
মোটা ঠোঁট দুটো মনে হয় শুঁয়োপোকা
সে নিজের ঠোঁটে চিবুকে আঙুল বুলিয়ে আবার কাঠি কাঠি আঙুলগুলো
গুনতে বসলো হঠাৎ টের পেলো তার শুকিয়ে যাওয়া
জিভ জলে ভরছে কানের মধ্যে গুবরে পোকার চলা ফেরার খড় খড়
আওয়াজ সে হঠাৎ শব্দ করে হাততালি দিয়ে উঠলো—
তখনই তার মা সিঁড়ি দিয়ে ছুটে আসা মা তার বিনুনি চেপে বললো
হতচ্ছাড়ি মেয়ে এইখানে বসে বায়োস্কোপ দ্যাখা হচ্ছে
অ্যাঁ বায়োস্কোপ তুই নাচবি নাচবি
কালীঘাটের গলিতে গলিতে নাচবি
পাশের বাড়ির রসুনের গন্ধে তার সার্কাসের কথা মনে পড়েছে, তারা
তিন ভাইবোন লাইন করে বাবার পিছনে গিয়ে যে-সার্কাস দেখেছে
অনেক আগে পৌঁছে তারা

জোকারের তোলাউনুন
দেখেছে আর রান্না বাড়ি ফিরতে
তার মা বললো আমি সার্কাস দেখি না, নৌটঙ্কি
চিড়িয়া উড় গায়া হো আজ সন্ধেবেলা বাবা
তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে সে কেন
কথা বলে না তার কী হয়েছে এরকম অনেক আশ্চর্য
কথায় যে-ডাক্তার সিগারেটের ধোঁয়ার
মত ঘর ভরিয়ে দেয়, সে তখন দ্যাখে ডাক্তারেরও
হাতে দশটা আঙুল দুপাশে দুটো কান টেবিলের নিচে উঁকি
মেরে পায়ের আঙুলও দেখতে যায় পায় না মোটা জুতো ঢাকা
সে তখন ভাবে ডাক্তারের মায়ের চোয়াল কেমন
ঠোঁট কেমন তিনি ডাক্তারের কপালে
কি চুমু খান তখনই তার মেরুদণ্ড মোচড়
দিয়ে ওঠে সে আরো কুঁজো হয়ে বসে
তাদের বাড়ির দেওয়ালে বহুকাল আগে
সবুজ রঙ ছিলো পলেস্তারার সঙ্গে তা খসে গেছে
ঘরে শুধু চুনবালি কুঁচিয়ে রাখা ময়লা সবুজ শাড়ি
ভাইয়ের প্রকৃতিপাঠ আর মীনার বানিয়ে বলা টেলিভিশন
টেবিলের উপর ট্যাবলেটের রাশি ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে সে
এককোণে ভাঁজ হয়ে থাকা হায়ার সেকেন্ডারির মার্কশিট খোলে
মীনারটাও বের করে সে মীনার চেয়ে বারো নম্বর
কম পেয়েছে কেন পেয়েছে
মীনারও তো কুড়িটা আঙুল মীনারও তো মায়ের শুঁয়োপোকা ঠোঁট
এছাড়া মীনা কথা বলে ক্যানক্যানে গলায়
মীনা অনেক মিথ্যে কথা বলে
মাঝে মাঝে ফড়িঙের মতো মীনা
খড়ের মত একটা হাত কোমরে দিয়ে বেঁকা হয়ে দাঁড়ায়
গুটগুটে পায়ে আলতা মেখে মার পিছনে রান্নাঘরে ঢোকে
সেই মীনা তার চেয়ে বারো নম্বর বেশি পায় কেন
সে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দ্যাখে তাদের গলিতে

চশমা পরা রোগা বুড়ো পিওন আসছে পিওন তাদের সিঁড়ির দরজার
তলা দিয়ে একটা চিঠি ঢুকিয়ে দেয়
সে আবার শোনে তার মার পায়ের শব্দ থস থস ইটের সিঁড়িতে
নামছে উঠছে খানিকবাদে দ্যাখে তার কোলে পোস্টকার্ড
নিচে লেখা ইতি চৈতালী
সে কিছুতেই চৈতালীর মুখ মনে করতে পারে না
চৈতালীও বোধহয় নাচে, না ?
কালীঘাটে গলিতে গলিতে নাচে,
ওরও কি শুঁয়োপোকা ঠোঁট চৈতালী কি দুপুরবেলা বিড়ি খায়
না চৈতালী ইতিহাস অনার্স নিয়ে পড়ে
সে কথা বলবে না
সে কিছু বলবে না
চৈতালীর ঠোঁট বিকট আঙুল জট পাকানো
সে কিছু বলবে না সে চৈতালীকে চিঠি লিখবে না
চৈতালীর চিবুকে হাত বোলাবে না
ঐ যে নৌটঙ্কি শুরু
কোমর দুলিয়ে নাচছে বাঁজা মেয়েরা
রসুনগন্ধ জোকার নাকে লাল গোল আঁটছে
সে কিছু বলবে না শুঁয়োপোকা ঠোঁট নেড়ে
সে কিছু বলবে না

অনুরাধা মহাপাত্র

আষাঢ়বিরহ

প্রাচীন গাছের উৎস ফিরে আসছে, প্রাচীন কথার দিন ;
দিন থেকে অনন্ত শেষ রাত । তোমার আলস্য, পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলা,
তাম্র-পাথুরে শরীরে মেঘের ছায়া, তালপাতার শোকগাথা—আবার
পাশ ফিরে গভীর পাথর, আষাঢ়বিরহ ।

২

মনে হয় গভীর কালো চুল ভেসে ওঠে কলমী-শ্যাওলাদামে ।
এই সেদিন দৃষ্টিপাত— আনন্দস্নান—কলমীদামে ফুলে ওঠে
সিন্ধু । সেই মৃত্যু, সেই মেঘরাস, সেই অবিবাহের বিরহ,
সেই সিঁড়ির কোণ চলে গেছে জলে— এইখানে নৌকো
ডুবলে শ্যাওলা-কলমীদামে আর একবার ঘন মাথা ভেসে ওঠে ।

৩

স্টোভ ধরানোর পরে বকুলফুল পুড়ে উঠছে আনত চোখে ।
ঘরের দেওয়ালে গাছ জড়ায় আমাকে—বকুলের
প্রাণ, পাশাবতী ভোমরা গেছে কোথায় ? স্টোভের তাতে
এক নিমেষ তার মুখ আষাঢ়ের অতিথি—

৪

এ' আষাঢ়ে সে কোথায় ! শুধু আমার সাপে কাটা, রুক্ষ
এলোচুল নদীর পথে পচে ওঠা পাপড়িমাখা কাদায়
লুটোয় ।
নদী যেখানে শেষ হয়ে গেছে—শুধু একটি
কৃষ্ণকরবী ফুটে আছে, দেখি ।

নিম

সিঁড়ির বাঁকে সে এসে দাঁড়ায়
জলের থেকে, গভীর নিমগাছ ;

এখন ঝরে শীতল নিম চোখ
কপাট তরে, ভেজানো আধেক ছিল ;
সিঁড়ির বাঁকে অস্ফুট নিমফুল
জলের ছায়ায় সিঁড়ির দাঁড় পড়ে ;
সে এসে দাঁড়ায়, দু'বাহু নিমগাছ ।

কৃষ্ণা বসু

কেঁপে ওঠে চাষীপাড়া

রাত কিছু গাঢ় হলে নদীতে ঢুকেছে
গাঢ় গেরুয়া রঙের জল, ঢুকে গেছে
ডি, ভি, সির বাঁধ ভেঙে মত্ত খল খল,
লাল জল ঢুকে গেছে গৃহস্থ খামারে,
নাচে জল প্রেতিনী ডাকিনী জল প্রবল হুতাশে,
ক্ষেত খায়, মাটি খায়, খায় শস্যকণা,
সকালের ঘুম থেকে উঠে তামাটে চাষীর বৌ দেখে
জল এসে উঠোনে ও গোয়ালে শুয়েছে,
শুয়ে আছে ধবলী ও লালী গাই-এর সঙ্গে
ঘিরে আছে চৈ চৈ হাঁসেদের পাড়াটিকে
সর্বনাশী রাঙা জল ঘরের দুয়ারে বসে আছে
ঘর খাবে গেরস্থ সংসার খাবে বলে ;
নদীটি সখীর মত ছিল বহুকাল,
অধিক প্রশ্রয়ে আজ সতীন হয়েছে !
সখীটি সতীন হলে কবে কে যে রেয়াত করেছে ?
চাষী বৌটি গাল দেয় থুতু দেয়, লোভী জল
গভীর নির্লজ্জ জল হো হো হেসে ওঠে,
কেঁপে ওঠে চাষীপাড়া তার ওই হাসির গুমোরে !

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

ভুল হাত

চৌকনো ঘরের মধ্যে স্তূপ স্তূপ জীবন
গর্ভের ভ্রূণ মেপে নিচ্ছে সময়ের দায়বদ্ধতা
হাত প্রদর্শনীতে অনেক হাত ঝুলে রয়েছে আমরণ
নিঃসঙ্গ একটা চিল কার্নিসে আড় হয়ে দেখছে ব্যাঙের ছাতা

হাত প্রদর্শনীতে আমার একটাও হাত পায়নি জায়গা
বাজার থেকে বাজারে নীলাম ডাকতে ডাকতে আমি যাচ্ছি
কেবলই মনে হচ্ছে ওই লম্বা হাতটা আমার চাই নতুবা...
ওই পুড়ে যাওয়া ছোপ-পরা হাতটা আমার চাই—ই

একটা বিশাল দুর্ভিক্ষের পর কাঁপছে জীবন
খরা, বন্যাকে পেছনে ফেলে ঋতুমতী হলো আবার পৃথিবী
তাই চাই আমার লম্বা হাতটা, ভীষণ বাঁচার আগুন
ধরিত্রী তোলপাড় করে কেবলই উঠছে ভুল হাত, হায় পৃথিবী

প্রেমের কবিতা

আমি চোখ না তুলেও টের পেয়ে যাই, অজস্র
শাদা-কালো ছবির নেগেটিভে ভরে যাচ্ছে আমার ময়লা
ঘর, ঠিক যেমন জল সরে গেলে থিকথিক করে কাদা।
আমার বিষণ্ণ হাত ফের তার কলমের সঙ্গে কথা চালাচালি
বন্ধ করে দিয়েছে আজ কতোদিন! তুমি কি জানতে সব
কিছু? এই যে তোমার সঙ্গে দেখা, আর ছাদের ওপর
ঝাঁকড়াচুলো তিনটে নারকেলগাছ অমনি হেসে উঠবে
পাতা দুলিয়ে— এতো সব নির্ধারিত ছিলো? তোমার
কাঠের তাকে তুলে রাখা প্রিজ্‌ম আমি কিন্তু ছুঁয়ে
দিইনি সে-দিন, মনে রেখো। বুঝে কিম্বা না বুঝে
আবার আমি এগিয়ে যাচ্ছি খুব সরু, লম্বা একটা
করিডোর বেয়ে। দু-পাশে সাঁকো হয়ে বেজে ওঠে
রবীন্দ্রসঙ্গীত। অন্ধকার, কাঁচুলির মতো আমার হৃদয়ে
এঁটে থাকা অন্ধকার, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট যেন, খসে পড়ছে
পথের ওপর। আমি ভয়ে ক্রমশ কুঁকড়ে যেতে
থাকি। কেননা, তোমার চারপাশে জমে থাকা আলোর
ব্যাপ্তি, তা আসলে শূন্যতা বই তো কিছু নয়!

বারুদ

হঠাৎ-হঠাৎ অন্ধকার স্বপ্নে কেন বাঘের দু'চোখ জ্বলে ওঠে?

সে কে? সে কার শরীরের মদির গন্ধ ধুয়ে-মুছে
ভুলে যেতে চেয়ে রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে
সারাদিন ভিড়ের ভিতর ঘুরে বেড়ায় রাস্তায়-রাস্তায়?

কতকাল নগ্ন হইনি আমি
কত দিন, কত রাত, কত অন্ধকার
ভয়, কার ভয়?

অরণ্যের শহরে শুধু বেঁচে আছি
হায়, মৃগনাভি, স্মৃতি-ঘ্রাণ সে কার?

জ্বলন্ত হৃদয়

শব্দ, তরবারি আর হৃদয়
খেলা করে এই ঘরের ভিতর
অন্ধকার সেই নারীর
যে প্রতিনিয়তই কথার
যা শোনা যায় না
অনেক তলার সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে
কেবলই যে উঠে আসে
আলিঙ্গনের চুম্বনের
হায়, স্তব্ধতা, মস্তিষ্কের
এই ঘর, এই শরীর
দেখা যায় না, দেখা যায় না
ঝরে-পড়া রক্তের
নিঃশব্দ হৃদয়
প্রবহমান শিরা-উপশিরার ভালোবাসার!

নারী, এই পৃথিবী

হে নারী, প্রেমিকা আমার
আজ তুমি কাছে, খুব কাছে
এর আগে তুমি কি ছিলে, কোথায়
অন্ধকারের জন্ম-দেয়ার যন্ত্রণা তুমি জানো
আজ আবার ভাসিয়ে নিচ্ছো আলোয় আমায়
সারা শরীরে ফুলের গন্ধ
কত ঋতুর পর আজ আবার বসন্ত
আমার কাছে, খুব কাছে
পাথরের মতো স্থবির হয়ে আর থেকো না
আমি দিতে চাই পুনর্বার আমার হৃদয়
আমি চাই আবার প্রতিটি রক্তবিন্দু কথা ব'লে উঠবে
পাখির কাছে, ফুলের কাছে, গাছের কাছে আমি
সত্য হ'য়ে উঠতে চাই
আমার ভিতর থেকে আলো ঝলসে উঠুক
মহাকাশের শূন্যতার ছায়ায়
আরো, আরো প্রসারিত হোক মানুষ আর পশুর
অসমাপ্ত যাত্রা
তাই, তাই, শুষে নিতে চাই আমার ভিতর তোমায়
তাই, তাই, অন্তঃসত্ত্বা হও তুমি আবার
মুক্তির তৃষ্ণায় আমার ভিতর ঝ'রে পড়ছে
যে বৃষ্টির কান্না
আমাদের দুজনার মিলনে ভাগ্য নির্ধারিত হোক
শৃঙ্খলিত পৃথিবীর
সমস্ত পাপ ধুয়ে যাক তোমার আমার
চোখের জলের ঝর্ণার আলোর ধারায় !

শ্যামলবরণ সাহা

কথামৃত

অশ্রুপতনের স্রোতে—
যে রাত্রি পেয়েছে শুধু নুনের দক্ষিণা,
সেই রাত তোমার কি কেউ নয় ?

ক্ষয়িষ্ণু রাতের ঘোরে যদি আলজিভ ক্ষয়ে যায়,
হাতের মুদ্রা যদি মুছে যায়,
তবু সারারাত কথা থাকে, কথা থেকে যায়...

অশ্রুপতনের বিরুদ্ধে শুধু একা-একা জেগে থাকে—
একটি অন্তর্যামী বাকমূল।

শম্ভু বসু

হায় সময় ! তোমার কি মহিমা !

একদিন যে ঘুরে বেড়াতো খা খা রোদে
রাতের অন্ধকার ভোরের আলোয় যার থাকতো না হুঁশ
পোশাকে থাকতো না রঙের বাহার
মাথায় থাকতো না ইবলিশের বুদ্ধি
হায় সময়ের পরিবর্তনে সেও পাল্টে গেছে।

এখন আর চিনতে পারে না খা খা রোদের বন্ধুদের...

চোখে তার রজনীগন্ধার জৌলুষ
পোশাকে দোপাটীর বাহার
শরীরে মেদের জোয়ার
অহংকারের চূড়ামণি।

হায় সময় ! তোমার কি মহিমা !

গৌতম হাজরা

যে ফিরে দাঁড়ায়

যে ফিরে দাঁড়ায়, তাকে কাছে আসতে বলি।
বলি : এই কারণে, উসকানো আগুনে তার দেহে
কতখানি লেগেছে তাপ আলো ও আঁধারে!
জানি, পাহাড়ের ওপারে আছে খাড়া দেওয়ালের মতো
শূন্যতা, পোড়া ডালপালা
তাই চেনা অচেনা রং-এর অভিজ্ঞতার আকাশ
আজও পাঁজর কাঁপায়!
ঐ যে দূরে গুহা, ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে অনেক অশ্রুজল
বাতাস কাঁপানো হাহাকার, ভুল
যে ভুলের মাশুল গুনতে গুনতে আজও যাই
চঞ্চল নদীটির পাশে, আর দেখি
কেমন করে সূর্যের তেজী ঘোড়া ক্ষুরের আঘাতে ভাঙে
শীতের পাহাড়!

রাহুল রায়

তোমার কথা-৫

যখন আমরা পরস্পর'কে চিনতে শুরু করলাম
তখন মৌন ছিলাম দুজনায়,
আমি মুগ্ধ ছিলাম ঘাসে-বৃষ্টিতে নিঝুমতায়
তুমি হঠাৎ হাসিতে ফুল ফোটাতে ঝিলের গুল্মে
আমি বিলের এক হাঁটু জলে ঠাণ্ডা বালুতে স্থির
তুমি নিঃশব্দে দুয়ার ভাঙছো আকাশের;
তবুও উচ্চারণে জড়তা ছিল দুজনার
স্তব্ধতায় ভিজেছে ভোর রাত, কান্নায় ক্লান্তিতে;
এই দূরত্বে আজ তাই দেখি
শরীর রয়েছে ব্যস্ত অন্যের উত্তাপে ওমে;
কিন্তু এখন'ও কি পারে
অন্য এক নারী অন্য এক পুরুষ
আমাদের মৌনতার উপত্যকা ঘাসে ভরিয়ে তুলতে!

নির্মল বসাক

জীবনচর্যা

সেই কুহকময় জগৎ সেও চিরস্থায়ী হল না
প্রথম সূর্যের আহ্বানে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম
পেছনে আমার পর্ণকুটির আর সামনে
একান্ত নিজস্ব সাগর সৈকত
এতো মুক্তি এতো মুক্তি নিয়ে কী করবো আমি

অভিমানের গায়ে হাত বোলাবার কেউ নেই
কেউ নেই রক্তিম চোখে চুমু খাবার
তেজী আর পেলব নাচের মাঝখানে কোন ফাঁক ছিল না
একটু বিশ্রামের আরামে নিজেকে ভরিয়ে নেবার
তবু আমার পাগলপারা যৌবন স্থিতু হতে চেয়েছিল
তোমাকে জড়িয়ে ধরে বেড়ে উঠতে চেয়েছিল ঝুমকোলতার মতো

আজ তুমি হাত ছাড়িয়ে নিলে অধর টিপে ধরলে নিজের ওষ্ঠের ওপর
আমি একটা কিছু রহস্যের মধ্যে তোমাকে রাখবো
সে সুযোগটুকুও আর দিলে না আমাকে মুক্তি দিয়ে দিলে
এতো মুক্তি নিয়ে কী করবো আমি
হাওয়ার মতো স্বাধীন হয়ে একটা ঝড় তুলবো

অভিমানের গায়ে আজ আর হাত বোলাবার কেউ নেই
পিছনে আমার পর্ণকুটির সামনে একান্ত নিজস্ব সাগর সৈকত
একটা সমস্ত রাত জাগার বিনিময়ে একটা রক্তিম ভোর আমার পাওনা ছিল না
এই পোশাক আর গাম্ভীর্যমাখা মুখের আড়ালে সমস্ত অতীত
চাপা দিয়ে দিলে

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী

বিলাসের বসবাস

তাঁবুর ভেতরে হাওয়া, দমচাপা, ধুলো ঘাম নুন
চাবুকের শপাং শপাং শিস গুমোটের শীত
পেঁছে দিচ্ছে বিলাসের রোমকূপে,
বিলাস দেখছে বসে একা
আফিং-খাওয়া বাঘের সার্কাস।

তাঁবু থেকে অন্ধকার, দশ বাই দশ—
বিলাস উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, পকেটে টিকিট।
ঘুমের আঠায় চোখ লেগে আসছে, পাড়া-জুড়নো ঘুম,
ঝাঁপ দিতে পারে না তবু কিছুতেই,
ঘুমের ওপারে ঠিক বসে থাকে জাগরণ
রঙীন টিকিট নিয়ে, বশম্বদ, ফিটফাট মুখ।

বিলাস ঢিপির মতো ডাঁই হয়ে থাকতে থাকতে
নিজের শরীর দিয়ে চেপে রাখছে নিজেরই শরীর—
শরীরের ভেতরে শরীর, নাকি বিলাসের লাশ
অন্ধকারে জ্যান্ত হয়ে ওঠে ?

রোজ এই ভৌতিকতা, একটানা, রোজ
আর নয়, হেস্তনেস্ত হয়ে যাক
ভোঁতা ছুরি হাতে নিয়ে বিলাস খুঁজতে থাকে অন্ধকারে
কায়ার পেছনে ছায়া, পৃথিবীর পিঠ।

জলের বশীকরণ

নড়ছে না ভিড়, সরছে না ইঁট, উদয়াস্ত দেয়াল,
চলতে-ফিরতে পাশ দেয় না, ঘনটে যাচ্ছে ছাল।
ঠোকর মারলো শহর, বাস হারিয়ে ভোঁ ভোঁ স্মৃতি,
ঘুরতে ঘুরতে জলের ধারে, এক জীবনের ইতি।

জল করেছে তুক,
আঁশি-জলে ভাসছে শোলার মুখ—
আঁশি-জলে ধুচ্ছি এঁটেল মাটি,
ভাবছি, এবার ভাঙবে ধোঁকার টাটি।

জলের ভেতর স্বপনকড়ি গুনতে-গুনতে যাই,
জলের নীচে ছড়িয়ে আছে ইচ্ছে-নুড়ির ডাঁই।
ভেবেছিলাম, উতরে গেছি ভুবন-ভাঙার বুজরুকি,
আলো-কালোর যোগসাজশে প্রমিতি, যা বহির্মুখী।

এখন দেখছি জলের বশীকরণ,
আলো-কালোর মধ্যখানে প্রতিবিম্বে দুলছে জলের জীবন—
প্রতিবিম্ব চতুর্দিকে, জলছবির এই বিশ্ব,
প্রতিবিম্বে মিলিয়ে গেছে রক্ত-মাংস-দৃশ্য।

পার্থপ্রিয় বসু

শব্দ দূষণ ও ব্রহ্মডিম

বাথরুমে স্নানের সময় আমি কল বন্ধ করে দিই,
না হ'লে শরীর ঝর্ণার থেকে ঝর ঝর জল পড়া
কানে আসে না। ধ্বনির মধ্যে ধ্বনি ঢুকলে
শব্দ ভেঙে যায়; তার শরীরের সহজ নিটোল,
হাত, পা, মাথা, বুক চুরমার হয়ে যায়।
যেমন পাহাড় ভাঙে বিস্ফোরক বরফের চাপে!
শব্দের ময়ূর পাখার চাঁদ, দাঁত আর নখের আদিম,
পল অনুপলে গাঁথা বনজপ্রহর মালা
ঝাঁ করে উড়ে যায় নাগালের চতুঃসীমা ছেড়ে।

সে সব শব্দের গুঁড়ো জ্যোতিষ্কের দূর প্রতিবেশে
রঙিন পাথর দেখে, গ্রহদের নিজস্ব চাঁদ।
আলোর বলয় ঘিরে তারা শুধু লক্ষ্যহীন ঘোরে,
যেন সন্ধের পার্ক স্ট্রীটে বেকার যুবক।

তারা বিফল-গ্রহণ পথে কখনো ফেরে না,
যেমন রবীন্দ্রগলায় গান আর কবিতার রেশ
ব্রহ্মডিমের কুসুমে রয়ে গেছে!

দিব্য মুখোপাধ্যায়

সময়ঘোটকী

কাল সারারাত এক পাগলী ঘোড়ার কবলে ছিলাম আমি

শহরের বুকে নেমেছিল ধীরে কাঁচাদুধ জ্যোৎস্নার আলো
রাজপথে দাঁড়িয়েছিল একটি ঘোড়া তার কেশর দুলিয়ে
শূন্যে তুলেছিল তার দুই ক্ষুর—প্রেম নাকি যুদ্ধের আহ্বানে

বাজে কথা নয় ; যখন আসছিলাম হেঁটে ফুটপাথ ধরে
কাল মধ্যরাতে, হ্রেষাধ্বনি শুনে হঠাৎ চমকে উঠে দেখি
পীচের রাস্তার অন্যদিক থেকে মিতছাঁদে এগিয়ে আসছে :
ডলফিন, প্রিমিয়ার অথবা মারুতি নয়— হাইওয়ের ওপর
আশ্চর্য বাদামী ঝলমলে এক ক্ষিপ্র বাহনহীন তুরগী

মুখবেশে ছুটে গিয়ে আমি ঝুলে পড়লাম তার গলা ধরে
আচম্বিতে সে যখন লাফিয়ে উঠল—নুয়ে পড়লাম তার
পিঠের ওপরে, আর শেষে ছুটতে থাকল আমাকে জড়িয়ে
যেন মাটি ছেড়ে এগিয়ে চলেছি দূর নক্ষত্রলোকের দিকে—

আকাশকুসুম রাত কেটে গেছে—অবিশ্রান্ত ছুটতে, ছুটতে,
কেঁপে উঠে আলিঙ্গনে বন্ধ হয়ে এসেছে আয়ত চোখদুটি
শেষে ফিকে হয়ে আসে অন্ধকার আর স্বচ্ছ ভোরের আলোয়
ফাঁকি দিয়ে ভেসে যায়— শূন্য, শূন্যের ভেতর, তৃপ্ত পাগলিনী।

ভালবাসার কবিতা

যখন আকাশ স্থির হয়ে কেঁপে ওঠে নীলে
এবং সবুজ ঘিরে থাকে প্রাণ

যখন রাত্রিগুলির কান্না দুমড়ে মুচড়ে বেজে ওঠে
আর ভেজা পথে প্রেমিকের পদশব্দ

যখন হাওয়ার টানে ভেসে যায় মিলিটারী ক্যাম্প
আর তীক্ষ্ম শিস দিয়ে ডেকে ওঠে পাখী

যখন মেয়েটা খুঁজে পায় ছেলেটাকে আর ফের
ছেলেটা আশ্চর্যভাবে খুঁজে পায় তার মাকে

যখন একটা ঠোঁট ছুঁয়ে যায় অন্য এক ঠোঁটে
আর কাঠফাটা মাঠের ওপর নামে বৃষ্টি

যখন সমস্ত রূপকথা আমাদের কাছে সত্যি হয়ে ওঠে
আর কালোভ্যান পাল্টে হলুদ মোটরগাড়ি হয়ে ফিরে আসে

যখন ডাক্তার অপারেশন টেবিল থেকে হেসে বেরিয়ে আসেন
আর তাঁর হাতে ধরা থাকে এক লতানো পাতার গাছ

যখন শ্যাওলাভরা ডোবার ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে শব
আর সূর্যদেব ভাসিয়ে ছড়িয়ে দেন, আলো, আলো

যখন বৃদ্ধেরা দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে রাখেন কচিদের প্রতি
আর ফিরে আসে ছাদের কার্নিশ থেকে মৃত্যুপথগামী

তখনই দুধের বান ছিঁড়ে ফেলে রাত্রি, ছিঁড়ে ফেলে অন্ধকার
তখনই মোমবাতির আলো থেকে নক্ষত্রে ভাসিয়ে নিয়ে যাই ভালবাসা
তখনই উড়তে থাকে শান্তিপতাকার সাদা রঙ মেঘের ভেতর
তখনই আশ্চর্য নিয়মে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের হৃদয়ের গান।

কু-মন্ত্রণা

সিঁদুরে বিষ ছিল।
তাই ধানের জমিতে ঢলে পড়েছিল দুজনে।
পাশাপাশি বিষাক্ত দেহ দুটো। একটা গোক্ষুরো
ফণা তুলে দু-চোখে দৃশ্যটা ধরেছিল। দিনের
বেলা কু-ডাক ডেকেছিল কালঞ্জ পাখি
ধানের ক্ষেতে তখন থম মেরে বাদুলে হাওয়া।
পাশাপাশি দুটো দেহ নারী ও সমর্থ পুরুষ।
বিষ ছিল কি সিঁদুরে নাকি হন্তারক সাপের
দাঁত?

পুরন্দরপুরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল দুজন। পাশে
পড়েছিল সিঁদুর ও বিষের কৌটো—জীবন ও মৃত্যুর রূপক।

প্রস্তুতি

ওপারে ভেঙে পড়ছে তীর,
শুভ মাস্তুলে পা রেখেছে শকুন।
তুমি প্রসন্ন হও।
তুষার ধস নামছে পথে
কাঁপছে চুড়ো।
তুমি প্রসন্ন হও।

চন্দ্রবিন্দু

যারা একদিন ঘোলা চাঁদ দেখিয়ে তোমাকে বলেছিল
মুগ্ধ হবার আগে—
খুব দূর থেকে দেখে নাও কলঙ্ক বলে কাকে।
আজ বুঝি সেসব সংকেতের জয়, বুঝি—
কপালে সিঁদুর রেখে মা কেন তুমি বৃত্ত আঁকো না!

পৃথিবীর সব কলঙ্কধারার পক্ষে দাঁড়িয়ে এক একদিন
ঐ চন্দ্র এবং বিন্দু আমি মিলিয়ে দেখেছি—
সুন্দর বলে কাকে!
দেখেছি সুন্দর তীব্র সুন্দরের যন্ত্রণার চেয়ে
এরকম অন্ধ যে ধর্মের গতি তার বিপক্ষে কেন মা?

এই বৈশাখে

গ্রীষ্মের আঁচে পুড়ে যাচ্ছে এক অনিলসখ্য পাখি
চেয়েছিলাম,
এ সময় দক্ষিণাঞ্চল ছেপে বৃষ্টি নামুক।

যেমন গাছেরা চেয়েছিল দামোদরে
এই বৈশাখে জলের পরমায়ু,
এবং ভাসুক চাল চুলো আর ছাপোষা ঘরের খাঁচা
তারপর,
অনিলসখ্য পাখির সঙ্গে মৃত্যু ডিঙিয়ে বাঁচা!...

নির্মল হালদার

কিরণমালী

তুমি কেমন ক'রে
পাহারা দাও
মায়ের সুষমায় মাছি বসছে, বোনটা চাইছিল পাপড়ি মেলতে
যেন প্রকৃতি শাড়ী মেলছিল, বর্ণময় শাড়ী
কে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে চ'লে গেল

আলো কি অস্ত্র নয়, আলো দিয়ে যে রুখতে পারি না
আমাদের অভাব

কিরণমালী, তুমি কি এখন পাহারা দেবে
শুধু চোখের জল ?

মা

স্তন দিতে দিতে শিশুকে দিয়েছো গীতিমাধুর্য
আমি কোথাও মুখ লুকাবো না
কুমারী মায়ের কোলেও শিশু করবে থৈ থৈ
কুমারী মা কোথাও মুখ লুকাবে না
স্তন দিতে দিতে শিশুকে দিয়েছো ভাষা
ভুলে যাই, আমার শীর্ণ হাত-পা

আশিস সান্যাল

আরণ্যক

ভয়ার্ত পাখির ডাকে
ভেঙে যায় ঘুম,
হরিণের পদশব্দে
অন্ধকারে
কেঁপে ওঠে ভয়ঙ্কর রাতের নিঝুম।

আদিম বাঘিনী খোঁজে
অতর্কিতে
শাবক চিত্রল—
তৃষ্ণায় হায়েনা সব
হ্রদের নির্জন বুকে
পান করে
রক্তমাখা পিপাসার একমাত্র জল।

চতুর শৃগাল চাটে
মৃত শব
সিংহের উচ্ছিষ্ট ক্ষত নারীদের স্তন।
সন্ত্রস্ত বাতাসে ভাসে
পচা গন্ধ
মিশর-প্রাসাদে হত
গণিকার নগ্ন-নীল দেহের মতন।

পেঁচার সংকেত পেয়ে
উড়ে যায়
সারসেরা দূর কোনও সিন্ধুর ওপারে
খুঁজে ফেরে
আরেক আশ্রয়।
অরণ্যের অন্ধকারে
কৃশ ছড়িয়ে পড়ে
শতাব্দীর ক্লান্তিকর শুধু এক ভয়।

সঞ্জয় রায়

একটি উড়াল পুল

একটি উড়াল পুল মাথা তুলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে
অনেক ওলোটপালোট হয়ে যায়।
আমাদের পাড়ার বংশীবাবু সম্ভাব্য উড়াল পুলের
গজিয়ে ওঠা একটি থাম শেষ হবার আগেই
অক্কা পেলেন।
এইখানে যদি পুলটার নির্মাণকর্তা বংশীবাবু হতেন
তাহলে সেই রাত্রেই পোস্টার পড়তো
কমরেড বংশী, তোমার অর্ধসমাপ্ত কাজ
আমরা সমাধা করবো।
বংশীবাবু, আপনি কি বাস্তবিক কল্পনা করেছিলেন
সেই উড়াল পুলের?
আমার বাবাও বলতেন, আর ক'বছর পর
আমাদের যাতায়াতের অসুবিধে অনেক লাঘব হয়ে যাবে—
আর মাত্র ক'বছর অপেক্ষায় থাকো। তারপর
উড়ে যাওয়া কার্পাসের মত তিনিও গা ঢাকা দিলেন।
অথচ অফিস ফেরত সন্ধ্যার বাতাস মেখে
পুল পার হয়ে মন্থর পায়ে পাড়ায় নামছেন
এইরকম একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখতেন আমার বাবা।

২.

এইরকম অনেক স্বপ্নকাতরতা আমাদের ছেয়ে আছে
নিদ্রার ভেতর।
এইরকম একটি উড়াল পুলের ভিতস্থাপনের পর
মনে আছে বেশ কবছর ধুণকর হেঁটে গেল পাশের রাস্তায়।
শহরে নদীর বান এসেছিলো, অবারিতভাবে, মনে আছে।
মনে আছে ক'বছর কাঁঠালের গন্ধে ভরে গিয়েছিলো
অপরাহ্ণের দিনগুলি।

এইরকম একটি উড়াল পুলের ভিতস্থাপনের পর
পার হয়ে গেলো বিবাহ ও বিচ্ছেদের মাসাবধিকাল—
এইরকম অনেক স্বপ্নকাতরতা নিয়ে একটি উড়াল পুল
প্রতিশ্রুতি হয়ে আছে আমাদের ধূসর জীবনে।

বিজয়কুমার দত্ত

তিথি

প্রত্যেকদিনই শ্মশানযাত্রীরা ফিরে আসে ঘরে।
কবরে ছড়ানো থাকে ফুল,
হাসপাতালের শূন্য বেডে, বিকেলের
শেষ আলো।
অথচ প্রত্যেকদিন-ই নবজাত শিশুর কান্নায়
ভোরের আকাশে বেজে ওঠে কসমিক কোরাস
উদ্ভিদের নত ডালে ফুল ও পাতার
নতুন প্রতিভা, ক্লোরোফিলে, পরাগে রেণুতে
মিশে যায়, অরণ্যসভায়।
প্রত্যেকদিনই তোমার জীবনে ভূমিকা আমার
ওই শ্মশানযাত্রীর ফিরে আসা—
কবরে ছড়ানো ফুলের গন্ধ,
হাসপাতালের বেডে পড়ে আসা বিকেল
একাকার হয়ে যায়।
তবু চকিতে তোমার মুখোমুখি হলে
তোমার ভারী মুখের জাদু, সমস্ত শিরায়
রক্ত চলাচলে, বুকের ওঠানামায়
যখন ছড়িয়ে যায়, তখনই
আমার নতুন জন্মতিথি।
তখন নবজাতকের অফুরান সম্ভাবনা,
আমার ধ্যানে ও প্রার্থনায়
ছবি-গান-ভাস্কর্য। নৃত্যপরা সুঠাম রমণী
একসঙ্গে ভেসে উঠতে চায়।

রাখাল বিশ্বাস

নির্জনতার কাছে

মন ভালো নেই, ভালো ছিল ? জানি না তো—
জ্যোৎস্না ভাসানো তৃষিত আঁখির রাত ও।
এদিকে ওদিকে বিমুগ্ধ ঝরা মুলে,
কাছে যারা ছিল তারাও গিয়েছে ভুলে।
সমর্পণের টান ছিল, টানে নাকি ?
গোপনে দহন তোমার সঙ্গে থাকি।
আমার যা কিছু একা কাটে ব্যাকুলতা,
শাদা বিছানায় ছুঁয়েছে বিষণ্ণতা
নবীন জলের ডাক শুনি বাতায়নে,
ওষ্ঠ নীলের সুখ থরো থরো ক্ষণে।
যেতে চাই আমি তবুও কি যাওয়া যাবে ?
বাতাস ভেঙেছে লোভের দগ্ধ তাপে।
আনত প্রহর চন্দনবন জেগে,
গান দিয়েছিলো আধারের নির্মেঘে।
শরীর জ্বালানো স্বপ্নে চাওয়ার কাছে,
ঝর্ণার হাসি আজো দেখি একা নাচে।
শ্বেত মর্মর কথা দাও, কথা রাখো,
তোমার মতই একাকী আমাকে ডাকো।

অরিজিৎ দাশগুপ্ত

শেষ ইচ্ছে

মানুষ হিসেবে যেইখানে যা যা করবার ছিল
সবই বেশ শান্তভাবে করা হয়ে গেছে।
মাঝে মধ্যে নেশা ও গম্ভীর গদ্য আলোচনা
অথবা টুকরো প্রেম, মদের আড্ডায় ভাঙচুর
আর কিছু বাকী নেই, মৃত্যু ছাড়া, শুধু মৃত্যু ছাড়া।
এখন ক্লান্ত দিন, না পাওয়া চিঠির জন্য লোভ
প্রিয় নারী তোর জন্য, মৃত্যুও কাম্য ছিল কবে ?
পুত্রমুখ দেখা ছাড়া অন্য কোন অভিলাষ নেই ॥

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

তিমির পেটের মতো

গতকাল ঝড়গ্রামে শালের জঙ্গলে এলোপাথাড়ি ঘুরে তিমির পেটের মতো ঠাণ্ডা আগুন লাগা চাঁদ নেমেছিল করতলে। চন্দ্র-পৃষ্ঠে এক চিলতে খন্দটুকুও পেলাম কলঙ্কবিহীন। আমার বাঁ হাতে সিগারেটের জ্বলন্ত লাল বিন্দু, অস্থির ভঙ্গিতে সেটা ডান হাতে নিয়ে এলে তার নীল ঝিলিক ক্রমাগত ক্লান্ত করে। মুখের রেখায় অনায়াসে মনের রঙ লুকোতে পারি। বন্ধুরাও সন্দেহ করতে পারে না অথবা পেরেও লুকোয়।

এ ভাবেই আয়ু রেখার শেষ প্রান্তে এসে নিজেকে টুকরো করে অন্য এক রমণী নদীর গহন কালো বেণীতে চুলের আড়ালে বহে যাওয়া।

তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রসাধনে কি করে প্রচ্ছন্ন রাখো তুমুল আগুন, বাইরে নিরুত্তাপ বৃত্তের তরঙ্গ মেলে রাখো অযোন অবাধ, বিকিরণে ঢালো পদ্ম সাদা রঙ। দুজনের সম্পর্ক ঘরের মেঝে বরাবর একটা ফাটল রেখার মতো তন্ময়তায় দেখে, যেন নির্দোষ আকাশ দেখছে ঘন বসুন্ধরা—অনেক অন্ধকারময়তা, রেলপথ সময়ের আড়াল পেরিয়ে ডান হাতের নীল ঝিলিকের সিগারেট বাঁ হাতে নিয়ে আসি। তখনি নীল আলোর বিন্দু বদলে যায় লালে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তিনটি কবিতা

R. S. V. P.

এক-একদিন কবিযশঃপ্রার্থী দেবদূতেরা দিগন্তে দিগন্তে দর্পণ ধরে
দাঁড়ায়, চারদিকে তখন কবিতার রোদ্দুর ঠিকরোতে থাকে ;
দুষ্টু, দুপ্ত ওলিম্পিকের ওরা সার্থকতা-অন্বেষী তরুণ। আবার
অন্য দিনগুলোয় তাদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। ওরা কি তখন
গোষ্ঠী গড়ে ?

আজ আমি তাদের ডেকেছি এই শতকশেষের
কবিসম্মেলনে
প্রত্যেকেই একটি করে কবিতা পড়বে :
তারি পরিসরের ভিতরে
দেখাক ওদের শক্তি
চিরন্তনের সংকলনে
জায়গা করে নিতে পারে কিনা

যারা আসবে না ঠিকই না-সূচক স্নিগ্ধ সাড়া দেবে,
ওদের চরিত্রে আজো ন্যূনতম সুভদ্রতা আছে ॥

আর্টেমিস, ২.

না-জন্মানো শিশুর শিয়র ব্যাপ্ত করেছিলে
নারীদেবতা, অপরিসীম শুশ্রূষার টানে,
তবু হঠাৎ যেসব শিশু বিকলাঙ্গ হবে

তাদের তুমি হত্যা করে ভ্রূণের অভিধানে
রেখে দিয়েছ নিপুণ অনায়াসে

আমি তোমার নৈর্ব্যক্তিক ধাত্রীভাষা জেনেও
অন্যভাবে মেতে উঠেছি, বস্তি থেকে অনূঢ়া প্রসূতির

অপরিমেয় স্নেহ

মাথায় নিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুরা আজ আমার জটায় হাসে

পের্সিফোনে

ঐ দ্যাখো গ্রীসদেশের দেবী পের্সিফোনের মিছিল বেরিয়েছে
অগ্নিমশাল হাতে,
ভাড়াটে পুরোহিতের দল ছুটে যাচ্ছে পুণ্যলালসায়
ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে

গদ্যেও নয় পদ্যেও নয়, তাদের ছোটার ছন্দ খুঁজি আমি,
শুদ্ধতার মোহে
যাবার পথে কুকুর ছাগল যা-কিছু পায় বলি দিচ্ছে ওরা
ভ্রান্ত সমারোহে।

সুকুমারী যাচ্ছিল এক, পুরোহিতেরা স্তনের বল্কল
সরিয়ে দিয়ে তাকে
যৌথ কশাঘাতে কাঁপায়, ওরা বলল এটাই পার্বণ
মাঘোৎসবের মাঘে।

এসব দেখে এসব শুনেও তাকিয়ে রয় নশ্বরীর মতো
করুণ পের্সিফোনে,
তার হাতে আর ক্ষমতা নেই, সব দেবতাই এখন পরিণত
চেয়ে-দেখার প্রহত টেলিফোনে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

পিঁপড়ে পোষা

অনেকে অনেক কিছু পোষে, আমি পুষি ডেঁয়ো পিঁপড়ে লাল—
সমস্ত সকাল
একটু একটু ক'রে চিনি দিই, আর শর্করামাতাল পিঁপড়েরা
উঠে আসে গায়ের ওপরে।

আমি ব্যক্তিগত কবিতা লিখবো না তো কে লিখবে, অশোক?
মাথার ভেতরে শুধু তত্ত্ব থাকলে যদি মহাকবি হওয়া যায়
তাহ'লে তো অনেকেই হ'তো।
আপাতত পিঁপড়েরা ওঠে নামে, ঘাম চেটে যায়,
আমাকে কামড়ে দেয়, কেননা কামড়ানো তাদের ধর্ম, ব্যবহার,
সারাটা জীবন গেলো পালিত পিঁপড়ের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে—
বেঘোরে হারালে প্রাণ হঠাৎ পূর্ণচ্ছেদ হ'তো, মন্দ না,
কিন্তু এই ছোটো ছোটো ছুঁচের ওপর দিয়ে নড়াচড়া করা
অন্য ধরনের ক্লেশ, বেশবাস পাল্টানো দায়।

খরচ অনেক বেশি, তবু পিঁপড়ে পোষার চেয়ে হাতি পোষা ভালো।

শান্ত রায়-এর
দুটি কবিতাগ্রন্থ

সন্ধের লোকাল ট্রেন
দশ টাকা

এই লেখাগুলি
চার টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩